পুরাণো গল্প

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

মূল্য ॥০ আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

৩।৮ নং জন্‌সন্ রোড্, ঢাকা

১৩৪৯

মুদ্রাকর

শ্রীমাখনলাল দত্ত,

জুবিলী প্রেস, ঢাকা।
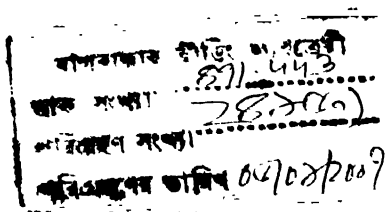
পুরাণো গল্প

জীমূতবাহন

অনেক—অনেকদিন আগে, সেই সত্যযুগে আমাদের দেশে জীমূতবাহন নামে এক পরমধার্ম্মিক প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠা, পরার্থপরতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য তাঁর নাম জগতে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। তাঁর সম্বন্ধে এখানে তোমাদের যে গল্পটি বল্‌বো, তার থেকেই তোমরা তাঁর মহাপ্রাণতার পরিচয় পাবে।

রাজা জীমূতবাহন একদিন সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; এমন সময় দেখ্‌লেন—এক বৃদ্ধা নাগিনী এক জায়গায় অতি বিষণ্ণভাবে ব'সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করছে। বৃদ্ধার চোখে জল দেখে, জীমূতবাহনের প্রাণ ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি নাগিনীকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"মা, তুমি এত কাঁদ্‌ছো কেন? তোমার কি হয়েছে?"

বৃদ্ধা চোখ দু'টি মুছে, গলাটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার ক'রে বল্‌লে—"বাবা, আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমার পুত্র মাত্র একটি; কিন্তু আজ তার জীবন-লীলার শেষ হ'য়ে যাবে।"

"কেন, কেন মা?"—একটু চঞ্চল এবং আশ্চর্য্য হ'য়েই রাজা জিজ্ঞেস কর্‌লেন।

বৃদ্ধা উত্তর দিলে—"বাবা, পক্ষিরাজ গরুড়ের নাম শুনেছ?"

—"শুনেছি মা। তিনি মহাবলবান এবং ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন।"

—"কিন্তু আমাদের নাগকুল তাঁর অত্যাচারে বুঝি বা শীগ্‌গিরই লোপ পাবে বাবা।"

"কেন, কেন, কিসের জন্য মা?"—রাজা জীমূতবাহনের বিস্ময় ও চঞ্চলতা যেন বেড়ে উঠ্‌লো।

বেদনাহতকণ্ঠে বৃদ্ধা উত্তর দিলে—"দেবরাজ ইন্দ্র গরুড়কে বর দিয়েছেন,—নাগকুল তাঁর ভক্ষ্য হ'বে। বর পেয়ে অবধি তিনি ইচ্ছামত নাগদের ভক্ষণ কর্‌তে আরম্ভ করেন। তাঁর কাণ্ড দেখে, নাগদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁদের ভারী চিন্তা হলো, 'তাই ত, এমন হ'লে ত কিছুদিন পরে পৃথিবীতে আর একটিও নাগ থাক্‌বে না!' তাঁরা অনেক ভেবে গরুড়ের কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন—'আপনি যদি ইচ্ছামত নাগদের হত্যা না করেন—তবে প্রতিদিন পালা ক'রে প্রত্যেক বাড়ী থেকে আপনার

আহারের জন্যে একটি ক'রে নাগ দেওয়া যাবে। সঙ্গে অন্যান্য ভোজ্যও থাক্‌বে।'

"প্রস্তাবটা বোধহয় গরুড়ের মন্দ লাগ্‌লো না। তিনি রাজী হ'লেন; কিন্তু ব'লে পাঠালেন—'যার যেদিন পালা পড়্‌বে—সেদিন তাকে অন্যান্য ভোজ্যের সঙ্গে এই সমুদ্রতীরে পাঠাতে হ'বে। তিনি সমুদ্রতীরে ব'সে ভোজন কর্‌বেন।'

"নাগেরা সকলেই তাই মেনে নিলে। না মেনে আর উপায়ই বা কি ছিলো!

"সেইদিন থেকে গরুড় এই সমুদ্রতীরে ব'সে দিনের পর দিন একটি ক'রে নাগ ভক্ষণ ক'রে আস্‌ছেন। এমনভাবে যে কত শত নাগ অকালে প্রাণ হারালো, তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। আজ আমার পুত্রের এবং একমাত্র পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা। ও চ'লে গেলে আমার বল্‌তে সংসারে আর কেউ থাক্‌বে না; তাই—"

প্রচণ্ড দুঃখের আবেগে বৃদ্ধার স্বর আট্‌কে গেলো। চোখে অজস্রধারায় জল ঝর্‌তে লাগ্‌লো। সে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লো না।

রাজা জীমূতবাহনেরও প্রাণ তখন বেদনায় ভ'রে উঠেছে! উঃ কি মর্ম্মভেদী ব্যাপার! এমনিভাবে যে পৃথিবীর একটি জাতিই লোপ পেয়ে যাবে! এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড কি নিবারণ করা যায় না? তা ছাড়া, এই নাগিনী যদি বৃদ্ধবয়সে পুত্রহারা

হয়, তবে পুত্রশোকে সে কি আর বাঁচ্‌তে পার্‌বে? অন্ততঃ এর পুত্রটিকেও কি আজ কোনভাবে রক্ষা করা যায় না!

জীমূতবাহন খুবই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধা আকুল হ'য়ে সতৃষ্ণনয়নে রাজার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লো।

অনেকক্ষণ ধ'রে ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাজা জীমূতবাহনের মাথায় যেন একটা বুদ্ধি জেগে উঠ্‌লো। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"আচ্ছা, মা, তোমার ছেলে এখন কোথায়?"

খানিকটা দূরে একটা বালুকাস্তূপের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে নাগিনী উত্তর দিলে—"ঐ যে ঐ স্তূপের উপর ব'সে গরুড়ের আগমনের অপেক্ষা কর্‌ছে। ওখানে আর কারও থাক্‌বার যো নেই। তাই আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। বাছাকে ফেলে বাড়ী ফিরে যেতেও পার্‌ছি না। হায়, হায়, কত কষ্টে বাছাকে এত বড়টি করেছি! আজ—"

বৃদ্ধা এবার একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

জীমূতবাহনের চোখেও তখন জল এসেছে। তিনি বল্‌লেন—"মা, কেঁদে আর কি কর্‌বে? আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা তোমার লাভ কি? পুত্রের মৃত্যু চোখে দেখার চেয়ে তোমার বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল। গরুড় এলে আমি তাকে অনুনয়-বিনয় ক'রে বুঝিয়ে যাতে তোমার ছেলের প্রাণরক্ষা কর্‌তে পারি, তার চেষ্টা কর্‌বো।"

বৃদ্ধা বল্‌লে“—বাবা, তুমি কে, তা তো আমি জানি না। তবে তুমি যে পরম দয়ালু—তা' তোমার কথাবার্ত্তা থেকেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু বাবা, বৃথা চেষ্টা। গরুড় কোন কথাই শুন্‌তে চাইবেন না। ক্ষিদেয় আকুল হ'য়ে এসেই খেতে আরম্ভ কর্‌বেন।”

“মুস্কিলের কথা বটে!”—জীমূতবাহন চিন্তিত স্বরে

বল্‌লেন—“তা যা হোক্, তুমি বাড়ী ফিরে যাও মা! শঙ্খচূড়কে রক্ষা কর্‌বার যখন কোন উপায় নেই, তখন অনর্থক মা হ'য়ে তার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখা আমি ভাল মনে করি না।”

বাষ্পাকুলকণ্ঠে নাগিনী বল্‌লে—“কিন্তু বাছাকে ছেড়ে বাড়ী ফিরে যেতে পা যে উঠ্‌ছে না, বাবা!”

"কিন্তু আর দেরি করাও ত ঠিক নয়, মা!" রাজার স্বরে এবার যেন একটু বেশি রকম চাঞ্চল্য ফুটে উঠ্‌লো ; "গরুড়ের আস্‌বার সময় সন্নিকট। এই সময় তুমি এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই যদি তিনি এসে পড়েন, তা হ'লে আমি তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষার আর কোন চেষ্টাই কর্‌তে পার্‌বো না। তার চেয়ে ভাল কথাই বল্‌ছি,—তুমি আর মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে এখান থেকে চ'লে যাও। দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ ত নেই-ই, উপরন্তু যেটুকু কল্যাণ হ'তে পার্‌তো তাও হ'বে না।"

বৃদ্ধা এবার বহুকষ্টে নিজকে সংযত ক'রে ধীরে ধীরে সে-স্থান ত্যাগ কর্‌লো।

সে খানিকটা দূরে চ'লে যেতেই জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের কাছে এসে বল্‌লেন—"ওহে শঙ্খচূড়, তোমার মায়ের মুখে আমি সব কথাই শুন্‌লাম। শুনে অবধি আমারও প্রাণ ব্যথায় কাতর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কি কর্‌বো, তোমাকে রক্ষা কর্‌বার উপায়ও দেখ্‌ছি না। গরুড়ের ভক্ষ্য আজ তোমায় হ'তেই হ'বে। তা' মর্‌তেই যখন বসেছ, তখন একটা সৎকাজ ক'রেই মর না? আমি ভারী ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছি। অথচ জলের নিকট পর্য্যন্ত যাবার সামর্থ্য আমার নেই। একটু পরে দারুণ পিপাসার জ্বালায় আমার প্রাণই হয়ত বেরিয়ে যাবে। তুমি আমার জন্যে সমুদ্র থেকে একটু জল এনে দিতে পার?"

শঙ্খচূড় জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কে আপনি ?"

—"আমি রাজা জীমূতবাহন। সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছিলাম।"

"কিন্তু সমুদ্রের জল ত পানের যোগ্য নয়!"—শঙ্খচূড় প্রশ্নপূর্ণনেত্রে জীমূতবাহনের দিকে তাকালো।

জীমূতবাহন উত্তর করলেন—"পানের যোগ্য না হ'লেও পান কর্‌তে হ'বে। তৃষ্ণায় প্রাণ যে যায়!"

শঙ্খচূড় একবার এদিক সেদিক চেয়ে যেন একটু ভয়ে ভয়েই বল্‌লে—"কিন্তু—"

সহসা রাজা বাধা দিলেন—"কিন্তু কি ?"

"এখনই হয়ত গরুড় এসে পড়্‌বেন।"—শঙ্খচূড় উত্তর দিলে; "এসেই যদি আমাকে এখানে দেখ্‌তে না পান, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ! ক্রুদ্ধ হ'য়ে তিনি হয়ত আবার সমগ্র নাগজাতির উপর অত্যাচার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌বেন।"

"না, না, এর মধ্যে তিনি এসে পড়্‌বেন না।"—জীমূতবাহন ব্যস্ততার সঙ্গে বল্‌লেন; "আর যদিই এসে পড়েন, আমি তাঁকে অনুনয়-বিনয় ক'রে একটু অপেক্ষা কর্‌তে বল্‌বো। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। তা' ছাড়া, দেখ, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দেওয়া পরম ধর্ম্ম। ইহলোকে ত এই হলো মরবার সময়—পরলোকের জন্য কিছু সঞ্চয় ক'রে যাও।"

কথাটা শঙ্খচূড়ের মনে ধর্‌লো। সে উত্তর দিলে—“আচ্ছা, অপেক্ষা করুন। আমি জল নিয়ে আস্‌ছি।”—ব'লেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়্‌লো।

শঙ্খচূড়ের গায়ে একটা লাল রঙের রেশমী চাদর ছিল।—ওটা না-কি তাদের জাতীয় পরিচ্ছদ! সে সেই চাদরখানা গায়ে দিয়েই সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে দেখে—জীমূতবাহন বল্‌লেন—“চাদরটা এখানে [illegible] [illegible]না। গরুড় এসে [illegible] চাদরটা দেখ্‌তে পেলেও বুঝ্‌বেন যে, তাঁর ভক্ষ্য হাজির আছে।”

শঙ্খচূড় ভেবে দেখ্‌লে—রাজার কথা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং সে রাজার কথামতই কাজ কর্‌লো।

সমুদ্রের জল অনেকটা দূরেই ছিল। শঙ্খচূড় জলের প্রায় কাছাকাছি এসেছে,—এমন সময় মাথার উপর এক প্রচণ্ড সন্‌-সন্‌ শব্দে রাজা জীমূতবাহন চম্‌কে উঠ্‌লেন; আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন—পক্ষিরাজ গরুড় আস্‌ছেন। অমনি আর এক মুহূর্ত্তও দেরি না ক'রে, রাজা শঙ্খচূড়ের চাদরখানা গায়ে মাথায় ঢাকা দিয়ে,—সেই বালুকাস্তূপের উপর ব'সে পড়্‌লেন।

এদিকে বিরাট শরীর নিয়ে, পাখার শব্দে চারদিকে যেন ঝড় বইয়ে, গরুড় নাম্‌লেন—সেই বালুকাস্তূপের উপর। তিনি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিলেন। নাগজাতির চিহ্ন লাল রেশমী চাদরে ঢাকা রাজাকেই শঙ্খচূড় মনে ক'রে গরুড় আর

তিলার্দ্ধ দেরি না ক'রে,—তাঁকে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় তিনি মানুষ খাচ্ছেন—না নাগ খাচ্ছেন,—সে বিষয়ে তাঁর কোন হুঁসই থাক্‌লো না।

ক্ষুধা যখন কতকটা নিবৃত্তি হয়েছে,—তখন যেন গরুড়ের কেমন মনে হলো! তিনি ভাব্‌লেন—তিনি কি সত্যিই নাগ খাচ্ছেন? না, এ-ত নাগমাংসের আস্বাদ নয়! তবে?

তখন ভক্ষ্যের দিকে তিনি ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌লেন।

দেখ্‌তেই তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন। অ্যাঁ, এ-কি? নাগ মনে ক'রে তিনি যে সত্যিই মানুষ খাচ্ছেন! তাঁর সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো! হায়, হায়, এ তিনি করেছেন কি?

ক্ষুধার জ্বালায় ভাল ক'রে না দেখে,—এ কোন্ নির্দ্দোষ মানুষকে তিনি হত্যা ক'রে ফেল্‌লেন! এঁর গায়ে নাগের পোষাকই বা কেন? কে ইনি?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাঁর ভক্ষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। রাজার মুখের উপর দৃষ্টি পড়্‌তেই গরুড়ের মুখখানা সহসা বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। নিজের উপর তাঁর ভয়ানক ধিক্কার জন্মালো। হায়, হায়, এ যে তাঁর বহু-পরিচিত পরমধার্ম্মিক রাজা জীমূতবাহন! ক্ষুধায় জ্ঞানহারা হ'য়ে, আজ এমন একজন মহাপুরুষকে হত্যা ক'রে ফেল্‌লেন তিনি!

তারপর ভাল ভাবে পরীক্ষা ক'রে তিনি বুঝ্‌লেন,—রাজার দেহের মধ্যে তখনও প্রাণ ধুক্‌ধুক্ কর্‌ছে।

আর কাল বিলম্ব না ক'রে গরুড় ছুট্‌লেন—বৈকুণ্ঠে ভগবান্ বিষ্ণুর কাছে।

গরুড়কে অতিশয় বিমর্ষ ও চঞ্চল দেখে, বিষ্ণু জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কি সংবাদ পক্ষিরাজ! তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?"

"আমি আজ একটা ভারী অন্যায় ক'রে ফেলেছি প্রভু"—ব'লেই গরুড় সব কথা বিষ্ণুর কাছে নিবেদন কর্‌লেন; ক'রে আবার বল্‌লেন—"রাজা জীমূতবাহনের প্রাণ রক্ষা কর্‌তেই হ'বে প্রভু! এতক্ষণে হয়ত তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

আপনি তাকে পুনর্জ্জীবন দান ক'রে আমাকে মহাপাপের ফলভোগ থেকে রক্ষা করুন।"

এইভাবে গরুড় বিষ্ণুর কাছে খুবই কাকুতি-মিনতি কর্‌তে লাগ্‌লেন।

শঙ্খচূড় নাগের জীবনরক্ষার জন্যেই যে মহাপ্রাণ রাজা আত্মদানেও কুণ্ঠিত হ'ন নি, অন্তর্য্যামী বিষ্ণুর তা বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌লো না। রাজার অসাধারণ মহাপ্রাণতা ভগবান্ বিষ্ণুর হৃদয় স্পর্শ কর্‌লো। তা ছাড়া গরুড়ের আকুল প্রার্থনাও তিনি এড়াতে পার্‌লেন না। সেই মুহূর্ত্তে গরুড়েরই পিঠে চ'ড়ে তিনি সমুদ্রতীরে নেমে এলেন।

নাগ শঙ্খচূড় তখন জল নিয়ে ফিরে এসেছিলো। কিন্তু জল খায় কে? রাজার শরীরের কোথাও তখন আর মাংস ছিলো না—গরুড় সব শেষ ক'রে ফেলেছেন; কেবল মুখখানি মাত্র অনেকটা অক্ষত আছে।

রাজার দশা দেখে শঙ্খচূড়েরও কিছু বুঝ্‌তে বাকী ছিলো না। সে তখন মনে মনে ভাব্‌ছিলো—ওঃ, এত বড় মহাপ্রাণ এই দেহের মধ্যে ছিলো! পরের জন্যে এইভাবে আত্মদান, ত্রিভুবনের মধ্যে ক'জন কর্‌তে পারে?—ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তার দুই চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌ছিলো।

এদিকে ভগবান্ বিষ্ণু সেখানে উপস্থিত হ'য়েই রাজা জীমূতবাহনের দেহে পরমস্নেহে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন। ভগবানের পুণ্য-হস্তের স্পর্শে রাজার সর্ব্বশরীর আবার পূর্ব্বের মত অক্ষত হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর দেহে প্রাণও ফিরে

এলো। তিনি চোখ মেল্‌তেই সম্মুখে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণুকে দেখে নতজানু হ'য়ে তাঁর স্তব কর্‌তে লাগ্‌লেন।

বিষ্ণু বল্‌লেন—"রাজা জীমূতবাহন, তোমার মহাপ্রাণতার পরিচয় পেয়ে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। পরের জন্য প্রাণ দান ক'রে তুমি যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করলে, তার ফলে জগতে যুগ যুগ ধ'রে তুমি অমর হ'য়ে থাক্‌বে। তোমার মহান্ কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ আমি তোমায় বর দিতে চাই। তুমি কি বর চাও, বলো।"

"ভগবান্!"—রাজা জীমূতবাহন ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"যদি আমার কার্য্যে আপনি সত্যই প্রীত হ'য়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ ক'রে আমায় এই বর দিন্,—যেন আজ থেকে নাগকুল আর গরুড়ের ভক্ষ্য না হয়।"

পরের জন্য প্রাণদানেও কুণ্ঠিত না হ'য়ে রাজা ত ইতিপূর্ব্বেই বিষ্ণুর হৃদয় জয় করেছিলেন,—তার উপর সমগ্র নাগজাতির কল্যাণ-কামনায় রাজার এই আগ্রহ দেখে, তিনি আরও প্রীত হ'য়ে গরুড়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"গরুড় শুন্‌ছো?"

গরুড় আকুলতার সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লেন—"দিন্, দিন্ ভগবান্, ঐ বরই দিন্। রাজা জীমূতবাহনের কার্য্যে আজ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। পরের প্রাণ নেওয়ার মধ্যে শক্তির দর্প থাক্‌তে পারে,—কিন্তু গৌরব কিছুমাত্র নেই। প্রকৃত শক্তি এবং গৌরব পরার্থে প্রাণদানের মধ্যেই নিহিত আছে। জীবহিংসা ধর্ম্ম নয়,—মহাপাপ!"

বিষ্ণু তখন রাজা জীমূতবাহনকে বল্‌লেন—"হে মহান্ মানব! পৃথিবী তোমার স্পর্শে পবিত্র হয়েছে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

রাজা জীমূতবাহন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বিষ্ণুকে প্রণাম ক'রে বল্‌লেন—"জয়—ভগবান্ বিষ্ণুর জয়!"

শঙ্খচূড় এতক্ষণ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিলো। এক্ষণে জীমূতবাহনের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে করযোড়ে বল্‌লে—"মহারাজ, আজ থেকে সমগ্র নাগজাতি চিরদিন ধ'রে তোমার জয় গান কর্‌বে। নাগকুল ঘরে ঘরে তোমার প্রতিমূর্ত্তি গ'ড়ে পূজা কর্‌বে।"

শঙ্খচূড়কে আলিঙ্গন ক'রে রাজা বল্‌লেন—"ভাই, সবই ঐ নারায়ণের ইচ্ছা। আমি কেউ নই!"

শাপ ও বর

'অষ্টাবক্র-সংহিতা' নামে আমাদের দেশে একখানি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ গ্রন্থ রচনা ক'রে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রে গেছেন।

অষ্টাবক্রের দেহের আটটি অঙ্গই ছিলো বাঁকা। আর সেইজন্যই তাঁর নাম হয়েছিলো অষ্টাবক্র। আবার শুনে আশ্চর্য্য হ'বে যে, তাঁর পিতা কাহোড় ঋষির অভিশাপের ফলেই তিনি বিকলাঙ্গ হ'য়ে জন্মেছিলেন।

অষ্টাবক্র যখন মাতৃগর্ভে—তখন ঋষি কাহোড় একদিন অষ্টাবক্রের মায়ের কাছে ব'সে বেদপাঠ কর্‌ছিলেন। কিন্তু পাঠে তাঁর প্রায়ই ভুল হচ্ছিলো। মাতৃগর্ভের ভিতর থেকেই অষ্টাবক্র হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"পিতা, আপনার বেদপাঠ শুদ্ধ হচ্ছে না,—আপনি আরও সংযতমনে পাঠ করুন।"

মাতৃগর্ভস্থ পুত্রের এই আচরণ ঋষি কাহোড়ের নিকট চরম ঔদ্ধত্য ব'লেই মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হ'য়ে তিনি অভিশাপ দিয়ে বস্‌লেন—"মায়ের গর্ভ থেকেই তুই যেমন পিতার অপমান কর্‌লি,—তেমনি তোকে বিকলাঙ্গ হ'য়ে ভূমিষ্ঠ হ'তে হ'বে। তোর দেহের আটটি অঙ্গই হ'বে বাঁকা।"

কাহোড়ের অভিশাপ ব্যর্থ হলো না। অষ্টাবক্রের জন্মের পর দেখা গেলো—পিতৃ-অভিশাপ তাঁর উপর বর্ণে বর্ণে ফলে' গেছে।

কিন্তু বিকলাঙ্গ হ'লেও অষ্টাবক্রের মত অত বড় পণ্ডিত, অত বড় শাস্ত্রজ্ঞ আর অগাধ জ্ঞানী ঋষি জগতে খুব কমই জন্মেছেন। সেইজন্য তিনি দেশের বড়-ছোট সকলের—এমন কি স্বর্গের দেবতাদেরও মাননীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

দেশের রাজা-মহারাজারা যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে মহর্ষি অষ্টাবক্রকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ কর্তেন। এমন কি অনেক সময় নিজেরা তাঁর আশ্রমে এসে বহু সমাদরে তাঁকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে যেতেন।

একবার রাজা ভগীরথ মহর্ষি অষ্টাবক্রকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভগীরথের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। ইনিই মহামুনি কপিলের শাপে ভস্মীভূত রাজা সগরের ষাটহাজার পুত্রের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। আর সেইজন্যই গঙ্গার অন্য এক নাম হয়েছে ভাগীরথী।

রাজা ভগীরথের দেহের মধ্যে কোথাও হাঁড় ছিলো না—সমগ্র দেহটাই কেবল মাংস দিয়ে তৈরী ছিলো। তাই তিনি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে বা বস্তে পার্তেন না।

ভাগীরথের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মহর্ষি অষ্টাবক্র যখন তাঁর সভায় এসে উপস্থিত হ'লেন—তখন তিনি ঋষিকে সম্মান দেখাবার জন্যে তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াতে গেলেন। কিন্তু শরীরে হাঁড় না থাকায় তিনি ত সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্লেনই না; উপরন্তু দাঁড়াতে গিয়ে, তাঁর গোটা শরীরটা বড় অদ্ভূত ভাবেই এঁকেবেঁকে গেলো!

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন···

এদিকে—জানোই ত যে, অষ্টাবক্রেরও ছিলো আটটি অঙ্গ বাঁকা—কাজেই তিনিও যখন সভায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর শরীরটি প্রায় ভগীরথের মতই বিশ্রীভাবে এঁকেবেঁকে

গিয়েছিলো। ভগীরথের দিকে চেয়ে অষ্টাবক্র ভাব্‌লেন—রাজা বুঝি তাঁকে উপহাস কর্‌ছেন। কাজেই বিশেষ ক্ষুণ্ণ হ'য়েই তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—"মহারাজ, যদি তুমি আমায় উপহাস ক'রে থাকো—তবে আমার অভিশাপে তোমার দেহ ঠিক অমনি ভাবেই এঁকেবেঁকে যাবে। কিন্তু যদি তুমি প্রকৃতই বিকলাঙ্গ হও, তবে আমার বরে তোমার দেহ সুন্দর, সুগঠিত ও সুঠাম হ'য়ে উঠ্‌বে।"

সঙ্গে সঙ্গে কি আশ্চর্য্য,—রাজা ভগীরথের দেহ অন্যান্য সকলের মতই দৃঢ় ও মজবুত হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে অন্যান্য মানুষের মতই বেশ স্বাভাবিক ভাবে অষ্টাবক্রকে প্রণাম ক'রে বল্‌লেন—"মহর্ষি, আজ আমার সুপ্রভাত! আজ আপনার বরে আমি নূতন জীবন লাভ কর্‌লাম। আমার সাধ্য কি যে, আপনাকে উপহাস করি। জন্মাবধি আমার শরীরে হাঁড় ছিলো না; কাজেই আমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে বা বস্‌তে পার্‌তাম না। কিন্তু আপনার মুখের কথা বিফল হবার নয়। আমি আপনাকে উপহাস করি নি ব'লেই আমার মাংসপিণ্ডের মত দেহ আজ স্বাভাবিক ও সুগঠিত হ'য়ে উঠেছে!"

মহর্ষি অষ্টাবক্র রাজা ভগীরথের কথা শুনে এবং তাঁর অঙ্গের বিকলতা দূর হ'তে দেখে, বিশেষ আনন্দিত হ'লেন।

বিকলাঙ্গ হওয়ার কষ্ট যে কি, তা তিনি নিজে বেশ ভাল ক'রেই জান্‌তেন। আজ একটি মানুষেরও সেই কষ্ট দূর করতে পেরেছেন দেখে—তিনি নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লেন এবং ভগীরথকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আবার বল্‌লেন—"মহারাজ, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে প্রজা পালন করুন। আপনার দেহে প্রভূত শক্তির সঞ্চার হোক্!"

ভগীরথ বল্‌লেন—"মহর্ষির কৃপায় আজ আমি কৃতার্থ!" কিন্তু অষ্টাবক্রের কথায় ভগীরথের দেহ স্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্‌লেও, তিনি নিজে যে তেমনি বিকলাঙ্গ থেকে গেলেন—তা বলাই বোধহয় বাহুল্য। পিতার অভিশাপে তাঁর ঐ দুর্দ্দশা হয়েছে; কিন্তু তা ব'লে পিতার প্রতি তিনি কোনদিনই অসন্তুষ্ট ছিলেন না। বরঞ্চ তাঁর পিতৃভক্তি ছিল অসাধারণ! মাতৃগর্ভের ভিতর থেকেই পিতার মনে আঘাত দিয়ে তিনি যেন নিজেকেই আজীবন অপরাধী মনে করতেন এবং কেমন ক'রে তিনি পিতাকে সন্তুষ্ট করতে পার্‌বেন—অবিরত সেকথাই চিন্তা কর্‌তেন।

একদিন অষ্টাবক্রের পিতা কাহোড় কোন কার্য্যোপলক্ষে মিথিলায় জনক রাজার সভায় গিয়েছিলেন। বন্দী নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভারতের অন্যান্য পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাজিত ক'রে তখন মিথিলায় অবস্থান করছিলেন।

প্রতিদিনই তিনি রাজা জনকের সভায় আস্‌তেন। বিজয়গর্ব্বে তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জনের যেন অন্ত ছিলো না!

কাহোড়ের সঙ্গে পরিচয় হ'তেই বন্দী নিজের পাণ্ডিত্যের খুবই বড়াই কর্‌তে লাগ্‌লেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর অহঙ্কার কাহোড়ের নিকট অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি আর স্থির থাক্‌তে না পেরে বন্দীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান কর্‌লেন।

তখন উভয়ের মধ্যে সর্ত্ত স্থির হলো,—যিনি পরাজিত হ'বেন,—তাঁকে গভীর জলে নিমজ্জিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হ'বে।

তারপর বেদান্তের বিষয় নিয়ে তাঁদের তর্ক আরম্ভ হলো। সেই তর্কযুদ্ধ দেখ্‌তে মিথিলার এবং আশেপাশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত রাজা জনকের সভায় এসে উপস্থিত হ'লেন।

যেমন বন্দী—তেমনি কাহোড়! পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, বিদ্যাবত্তায় ও অভিজ্ঞতায় কেউ কারও থেকে কম যান না। উভয়ের কণ্ঠেই যেন স্বয়ং দেবী সরস্বতী এসে আবির্ভূত হয়েছেন!

ক্রমাগত সাতদিন ধ'রে তাঁদের তুমুল তর্কযুদ্ধ চল্‌লো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হ'তে হলো অষ্টাবক্রের পিতা কাহোড়কেই।

ওঃ বন্দীর তখন কি আস্ফালন! একে ত তিনি পূর্ব্বেই ভারতের বড় বড় পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছেন, তার উপর আজ

কাহোড়কে পরাজিত ক'রে, তাঁর গর্ব্বের যেন আর সীমা থাকলো না! অবশ্য এটাও অস্বীকার্য্য নয় যে, গর্ব্ব করবার তাঁর অধিকার আছে। একা সমগ্র ভারতের পণ্ডিতগণকে পরাজিত করা ত আর কম পাণ্ডিত্যের কথা নয়। তবে মানুষ যতই বড় হোক্—গর্ব্ব করা তার পক্ষে নিতান্তই অশোভন!

রাজা জনক ছিলেন সেই তর্কযুদ্ধের বিচারক। তিনি কাহোড়কে বল্লেন—"ঋষিবর, নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বল্তে হচ্ছে যে, পণের সর্ত্তানুযায়ী আপনাকে গভীর জলে নিমজ্জিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ কর্তে হ'বে। তবে যদি বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবর বন্দী অন্য কোনরূপ মীমাংসা করেন,—তা হ'লে আমি অবশ্য সুখী হ'ব।"

বন্দী কিছুমাত্র দ্বিধা বা ইতস্ততঃ না ক'রে উত্তর দিলেন—"না, মহারাজ, অন্য কোনভাবে এর মীমাংসা হ'তে পারে না।"

"আমি তা চাইও না!"—সদর্পে এবং দৃঢ়কণ্ঠেই কাহোড় ব'লে উঠ্লেন—"যখন মর্তেই হবে একদিন, তখন সত্যপালন ক'রে মৃত্যু বরণ করাই গৌরবের। চলুন, আমি এক্ষুনি সর্ব্বসমক্ষে জলে নিমগ্ন হ'য়ে প্রাণত্যাগ কর্বো।"

সমগ্র রাজসভা তাঁর এই নির্ভীক অকুণ্ঠিত উত্তরে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো! সকলেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটা ক'রে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কর্লেন।

রাজা জনক বল্‌লেন—"না, আজ নয়। কারণ, ঐ দেখুন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। কাল সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর পরে, আপনি সর্ত্ত পালন কর্‌বেন। কি বলেন পণ্ডিতবর, আপনার কি মত ?"—ব'লেই তিনি বন্দীর দিকে চাইলেন।

বন্দী উত্তর কর্‌লেন—"আচ্ছা, তাই হ'বে।"

এদিকে কেমন ক'রে জানি না, সংবাদটা অষ্টাবক্রের কানে এসে পোঁছল। পিতার পরিণামের কথা ভেবে তিনি অতিশয় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন ; ব্যথার আবেগে তাঁর প্রাণের ভিতরটা গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তিনি আর স্থির থাক্‌তে না পেরে তৎক্ষণাৎ আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন এবং তিনদিনের পথ যোগবলে মাত্র তিন ঘণ্টায় অতিক্রম ক'রে মিথিলায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

সেখানে তখন এক দারুণ ক্ষোভের ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হ'তে চলেছে। মিথিলার সুগভীর রাজ-সরোবরের চার পাড় লোকে লোকারণ্য! ঘাটের সিঁড়ির উপর রাজা জনক, পণ্ডিত বন্দী এবং আরও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। অদূরে ঋষি কাহোড় একবুক জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলের নিকট থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিচ্ছেন। মুখে তাঁর বিষাদের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই,—যেন সানন্দেই তিনি মৃত্যুকে বরণ করতে অগ্রসর হয়েছেন!

চারদিক নিস্তব্ধ-নিথর! কারও মুখে কোন কথা নেই,—কারও চোখে পলক পড়্ছে না। ক্ষণকাল পরে যে শোচনীয় কাণ্ড ঘট্বে তার জন্য যেন প্রকৃতিও স্তব্ধ আর মূহ্যমান হ'য়ে উঠেছে।

মৃত্যুকে বরণ কর্তে অগ্রসর হয়েছেন

হঠাৎ সেই অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ ক'রে শব্দ উঠ্লো—"মহারাজ!"

রাজা জনক এবং অন্যান্য সকলেই চম্‌কে উঠে, চোখ ফিরিয়ে দেখ্লেন—অষ্টাবক্র উপস্থিত!

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লেন। অষ্টাবক্র সঙ্কেতে পিতাকে অপেক্ষা কর্‌তে ব'লে, জনককে প্রশ্ন কর্‌লেন—"আমার পিতা কার কাছে তর্কে পরাজিত হয়েছেন মহারাজ ?"

"মহাপণ্ডিত বন্দীর কাছে।"—জনক উত্তর কর্‌লেন; "এই যে পণ্ডিতবর বন্দী।"—ব'লেই তিনি বন্দীর সঙ্গে অষ্টাবক্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অষ্টাবক্র তখন বন্দীর দিকে এগিয়ে বল্‌লেন—"পণ্ডিতবর, আপনার অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্যে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌ছি। কিন্তু শাস্ত্রে আছে,—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ', পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তা হ'লে মহর্ষি কাহোড়ের আত্মাই অষ্টাবক্র বা আমি। আমাকে পরাজিত না কর্‌লে আমার পিতার পরাজয় সম্পূর্ণ হয় না। তাই প্রার্থনা, আপনি আমার সঙ্গে যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা, তর্ক করুন। যদি আমায় পরাজিত কর্‌তে পারেন—তবে আমার পিতার ত কথাই নেই,—আমিও এই সরোবরের জলে নিমগ্ন হ'য়ে আত্মবিসর্জ্জন কর্‌বো। আর যদি আমি জয় লাভ কর্‌তে পারি—তা হ'লে আমার পিতা পণ থেকে মুক্তিলাভ কর্‌বেন,—আর পরিবর্ত্তে আপনাকে জলে নিমজ্জিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হ'বে।"

অষ্টাবক্রের কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে সকলের বিস্ময় ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌লো! বিস্ফারিত চক্ষে সকলেই অষ্টাবক্রের দিকে তাকালেন।

বন্দী মৃদু হেসে সগর্বে বল্‌লেন---"আপনার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে অবশ্য আমার আপত্তি নেই, তবে আমার মনে হয়—তাতে কল্যাণ না হ'য়ে আরও বেশি অকল্যাণ হ'বে। যেহেতু যা সহজ ব'লে ভাব্‌ছেন, বস্তুতঃ তা অতিশয় কঠিন। এখনও বুঝে দেখুন।"

"আর কিছুই বোঝ্‌বার নেই পণ্ডিতবর!"—অষ্টাবক্র অবিচলিত ভাবেই উত্তর কর্‌লেন;—"আমি আপনার নিকট যে প্রস্তাব করেছি,—তা ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তেই করেছি। এখন দয়া ক'রে আমার প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে আপনি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।"

বন্দী আর কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে বল্‌লেন--"বেশ, তাই হোক্।"

মুহূর্ত্তে চারদিকে যেন একটা কলরব প'ড়ে গেল। রাজা জনক কাহোড়কে জল থেকে উঠে আস্‌তে বল্‌লেন।

পুত্রের প্রস্তাবে কাহোড় নিজেও তখন খুবই আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠেছিলেন। পাছে পরিণাম আরও শোচনীয় হ'য়ে উঠে—এই আশঙ্কায় তাঁর প্রাণও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তবুও

তিনি কোনরূপ প্রতিবাদ না ক'রে ধীরে ধীরে জল থেকে উঠে এলেন।

অবিলম্বে আবার এক তর্কসভার আয়োজন হ'য়ে গেলো। অষ্টাবক্র এবং বন্দী দু'জন বাদানুবাদ সুরু কর্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁদের তর্কযুদ্ধ বেশ ঘোরাল হ'য়ে উঠ্‌লো। দর্শকগণ ফলাফলের আশায় যেমন উদ্‌গ্রীব,—তেমন অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন।

ঋষি কাহোড় সভার একপাশে ব'সে সতৃষ্ণনয়নে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তাঁর বুকের স্পন্দন তখন অতিশয় দ্রুত হ'য়ে উঠেছে!

তিন-চারদিন ধ'রে অবিরাম তর্ক চল্‌তে চল্‌তে পরিশেষে অষ্টাবক্রের কাছে ভারতবিজয়ী মহাপণ্ডিত বন্দীই পরাস্ত হ'লেন! অমনি চারদিকে একটা মস্ত হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো! প্রগাঢ় লজ্জায় এবং ক্ষোভে বন্দী মাথা নামিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।

সভাস্থ সকলেই সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লেন—"ধন্য অষ্টাবক্র, ধন্য আপনার পাণ্ডিত্য!"

কাহোড় তাড়াতাড়ি উঠে এসে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন। আনন্দের আতিশয্যে তাঁর মুখে কথা ফুট্‌লো না; কিন্তু চোখ দিয়ে তাঁর ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌লো।

হঠাৎ মাথা তুলে বন্দী বল্‌লেন—“আমি স্বীকার কর্‌ছি, অষ্টাবক্র পাণ্ডিত্যে ও শাস্ত্রজ্ঞানে আমার অনেক উচ্চে। এখন চলুন সকলে রাজ-সরোবরে ; সত্যরক্ষার্থ আমি এই দণ্ডেই জলে নিমগ্ন হ'য়ে প্রাণত্যাগ কর্‌বো।

অষ্টাবক্র তাঁর সম্মুখে এসে হাত যোড় ক'রে বল্‌লেন—“আমার অপরাধ নেবেন না পণ্ডিতবর! যদিও আমি জয়ী—তবু আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য আমাকে চমৎকৃত ক'রে তুলেছে। আপনার মত একটি রত্ন ভারত থেকে লুপ্ত হোক্—এ আমি চাই না। আমি আপনার পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মানের জন্য, আপনাকে পণ থেকে মুক্তি দিচ্ছি।”

অষ্টাবক্রের এই উদারতায় আবার সকলে তাঁকে ধন্য ধন্য ক'রে উঠ্‌লেন। বন্দীও বিস্ময়ান্বিতভাবে গদ্‌গদকণ্ঠে বল্‌লেন—“মহর্ষি অষ্টাবক্র, আপনি এত মহৎ! শুধু পাণ্ডিত্যে নয়—মানবতার দিক দিয়েও আপনি আমার অনেক উচ্চে।”

দেখে শুনে পুত্র-গৌরবে কাহোড়ের বুক স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। অষ্টাবক্রের প্রগাঢ় পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়েও তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হ'লেন। পুত্রের প্রতি স্বীয় অভিশাপের জন্যও আজ তাঁর মনে অনুতাপ জেগে উঠ্‌লো। তিনি অষ্টাবক্রের মাথায় হাত দিয়ে পরম স্নেহে বল্‌লেন—“বৎস, আজ তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করেছো! তোমার অসীম

পিতৃভক্তিই আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। তোমার গুণে আমি আজ যে অপার আনন্দ লাভ করেছি, তা বাস্তবিকই দুর্ল্লভ! তুমি 'সমঙ্ক' নদীতে গিয়ে স্নান করো। আমার বরে স্নানের পর তুমি উত্তমাঙ্গ লাভ করবে। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আর কোনরূপ বিকলতা থাক্‌বে না।"

পিতাকে প্রণাম ক'রে অষ্টাবক্র সমঙ্ক নদীর উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লেন। কাহোড়ের বাক্য নিষ্ফল হলো না।

সমঙ্ক নদীর জলে স্নান ক'রে উঠ্‌তেই অষ্টাবক্র দেখ্‌লেন, তাঁর শরীরের কোন স্থানই আর বিকল বা অস্বাভাবিক নেই! সমগ্র দেহ যথারীতি সুগঠিত ও সুঠাম হ'য়ে উঠেছে।

তঞ্জন ও ত্রিশিরা

—এক—

তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর নাম হয়ত তোমাদের অজানা নয়। দুইটি স্থানই মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত। স্থান দুইটি কেমন ক'রে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী ব'লে অভিহিত হলো, সে সম্বন্ধে চমৎকার একটি পৌরাণিক আখ্যান আছে। সেই গল্পই এখানে তোমাদের বল্‌বো।

এখন যাকে 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী' বলে, প্রাচীনকালে সেই অঞ্চলে এক গভীর বনে তঞ্জন নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস বাস কর্‌তো। সে যেমন বলশালী আবার তেমনই দুর্দ্দান্ত ও অত্যাচারী ছিলো—এমন কি, দেবতারাও তাকে জব্দ কর্‌তে পার্‌তেন না। একবার এক গন্ধর্ব্বকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রও তার কাছে পরাজিত হ'ন। ফলে তঞ্জনের স্পর্দ্ধা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে উঠে।

তারপর একেবারে বেপরোয়া হ'য়ে সে তার অধ্যুষিত অঞ্চলে এমন উপদ্রব কর্‌তে সুরু করে যে, মানুষ ত দূরের কথা পশুপক্ষী পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে প্রাণভয়ে সে-অঞ্চল থেকে পালিয়ে যায়।

প্রতিদিন মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে—কুকুর-বেড়াল, এমন কি ছোট ছোট পাখী পর্য্যন্ত কত জীব যে তঞ্জন অকাতরে হত্যা কর্‌তো, তার ইয়ত্তা ছিলো না। জীবহত্যাই ছিলো তার একমাত্র কাজ এবং তাতে সে আনন্দও লাভ কর্‌তো প্রচুর!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ অঞ্চল একেবারে জীবশূন্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

ঘর-বাড়ী আছে, লোক নেই। চারদিকের মাঠগুলো যেন মরুভূমির মতই খাঁ-খাঁ কর্‌ছে; তার বুকে কোথাও এক কণা শস্য নেই। গাছপালাগুলো পর্য্যন্ত যেন রাক্ষসের দারুণ উপদ্রবে সবুজ শোভা হারিয়ে ফেলেছে। দেশের রাজা যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তার ঠিক-ঠিকানাই নেই। জায়গাটার দিকে চাইলে সত্যই চোখে জল এসে পড়তো! আহা এমন ধন-ধান্যে ভরা সুন্দর দেশ; রাক্ষসের উপদ্রবে আজ তার কি দুর্দ্দশাই না হয়েছে!

একদিন আগ্নেয় নামে এক মুনি হঠাৎ তঞ্জনের বনে তপস্যা করতে এলেন। জায়গাটা একেবারে নির্জ্জন দেখে, তিনি ভাব্‌লেন—এখানে তাঁর তপস্যা বেশ ভালভাবেই চল্‌বে। বলা বাহুল্য, তঞ্জনের দুরন্তপনার কথা তাঁর জানা ছিলো না; কাজেই তিনি বেশ খুশী হ'য়েই লতাপাতা প্রভৃতি যোগাড় ক'রে এক আশ্রম তৈরী ক'রে ফেল্‌লেন।

দু'-একদিন পরে তাঁর মনে কিন্তু কেমন খট্‌কা লাগ্‌লো। তাই ত, মানুষ না হয় না থাক্‌তে পারে,—কিন্তু বনের জীবজন্তু সব গেলো কোথায় ? একটা হরিণ,—এমন কি একটা পাখীও যে কোথাও দেখা যায় না !—ব্যাপার কি !

নির্জ্জনতার জন্যে মুনি-ঋষিরা বন ভালবাস্‌লেও, বনে জীবজন্তুও থাক্‌বে না, এটা যেন তাঁদের কাছে নিতান্ত বিসদৃশ ও অস্বস্তিকর ব'লেই বোধ হয়। আর বাস্তবিকই বন-জঙ্গলের সে অবস্থা নিতান্ত অস্বাভাবিক। তবু কোন রকমে মনের অস্বস্তি দূর ক'রে আগ্নেয় মুনি আশ্রমের সম্মুখে এক সুবৃহৎ বনস্পতির মূলে ব'সে তপস্যা করতে আরম্ভ কর্‌লেন।

তপস্যায় যখন তিনি মগ্ন হন, তখন তাঁর আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সেই সময়ে তিনি যেন এই সংসার ছেড়ে কোন্ এক কল্পলোকে চ'লে যান। তাঁর চারদিকে কোথায় কি হচ্ছে,—কে কি কর্‌ছে, এমন কি ঝড়-বৃষ্টি পর্য্যন্ত হচ্ছে কি না হচ্ছে, সে সম্বন্ধেও তার হুঁস থাকে না।

একদিন তিনি ঐরূপ বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে তপস্যা কর্‌ছেন ; এমন সময় তঞ্জন ধীরে ধীরে এসে তাঁর পেছনে দাঁড়ালো। তারপর তাঁর আপাদমস্তক বেশ ভাল ক'রে দেখে আপন মনে বল্‌লে—"না, এটার দেহে মাংস একেবারেই নেই। এটাকে খেয়ে না হ'বে সুখ—না ভর্‌বে পেট। তবে আজ যখন আর অন্য

কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন অগত্যা এই মুনিটাকে খেয়েই কোন রকমে পিত্তিরক্ষা কর্‌তে হ'বে।" এই ভেবে সে যেমন এগিয়ে গিয়ে আগ্নেয় মুনির গলা চেপে ধরেছে,—অমনি মুনি মুদিত চক্ষেই ডেকে উঠ্‌লেন—"নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!"

সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত ব্যাপার ঘট্‌লো! শূন্যমার্গ থেকে এক ভীষণ চক্র সাঁ ক'রে ছুটে এসে রাক্ষস তঞ্জনের গলা কাটে আর কি! চক্রের দিকে চোখ পড়্‌তেই তঞ্জনের প্রাণ ভয়ে শুকিয়ে গেলো! সে আগ্নেয় মুনিকে ছেড়ে দিয়ে মারলো দৌড়।

কিন্তু দৌড়ালেই কি আর রক্ষা আছে ? রাক্ষস যত দৌড় দেয় চক্রও সাঁ-সাঁ ক'রে তার পিছু পিছু যায়। তঞ্জন ভাবে—এ আবার কি ফ্যাসাদ রে বাবা! হাজার হাজার মানুষ তার পেটে হজম হ'য়ে গেল, আর একটা প্যাকাটির মত সরু সরু হাত-পাওয়ালা মুনিকে খেতে গিয়েই এত দুর্ভোগ! ছুটে ছুটে ত তঞ্জনের প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম! তার মুখে ফেনা ভাঙ্তে লাগ্‌লো! সে বেশ বুঝতে পার্‌লো, এ বিষ্ণুচক্র, এর কাছে কারও রক্ষা নেই। মুনি নিশ্চয়ই বিষ্ণুভক্ত, তাই তাকে খেতে গিয়ে এই বিপদ!

ছুটে ছুটে সে যখন আর পার্‌লো না, তখন হাত যোড় ক'রে ডাক্‌লো—"হে বিষ্ণু, হে নারায়ণ, রক্ষা কর, রক্ষা কর! প্রাণ যায়!"

'ভূতের মুখে রাম নাম' ব'লে একটা প্রবাদ আছে। রাক্ষস তঞ্জনের মুখে 'নারায়ণের' নামও ঠিক তেমনই শোনালো; কিন্তু তবু সে কাতরস্বরে নারায়ণকে ডাক্‌তেই বিষ্ণুচক্রের গতি সহসা স্তব্ধ হ'য়ে গেলো! নারায়ণ স্ব-মূর্ত্তিতে সেখানে আবির্ভূত হ'য়ে বল্‌লেন—"কেমন আর কোনদিন বিষ্ণুভক্তকে আক্রমণ করবে ?" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তঞ্জনের মাথা লক্ষ্য ক'রে হাতের গদাও তুল্‌লেন।

বিশাল এবং ভয়ঙ্কর সে গদা! তার একটি আঘাতেই যে সর্ব্বশরীর একেবারে চূর্ণ হ'য়ে যাবে—তা বুঝ্‌তে পেরেই তঞ্জন

আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"না, না, না! আর কখনও বিষ্ণুভক্তকে আক্রমণ কর্‌বো না। এবারকার মত আমায় রক্ষা করুন।"

"না, তোমায় কোন মতেই রক্ষা করা যায় না।"—কর্কশস্বরে বিষ্ণু জবাব দিলেন; "তোমার ভীষণ অত্যাচার, উপদ্রব ও নিষ্ঠুরতায় শান্তিপূর্ণ সুন্দর জনপদ আজ মরুভূমির মতই খাঁ-খাঁ কর্‌ছে। তোমার দারুণ হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌তে তুমি যে জীবহত্যা করেছ, তার ইয়ত্তা নেই। তোমার আর বেঁচে থাকা বিধাতার সৃষ্টির পক্ষে ঘোর অমঙ্গল! আমি আর তোমায় কিছুতেই ক্ষমা কর্‌তে পারি না।"—ব'লেই তিনি শূন্যমার্গে স্থির এবং রুদ্ধগতি চক্রের দিকে চেয়ে কি যেন ইঙ্গিত কর্‌লেন।

অমনি বিষ্ণুচক্রও সবেগে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। আর রক্ষা নেই বুঝে তঞ্জন তখন বিষ্ণুর কাছে নিবেদন কর্‌লে—"প্রভু, তা হ'লে মর্‌বার আগে আমায় একটি বর দিন্।"

"কি?"—বিষ্ণু ভ্রূকুটি ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌লেন।

তঞ্জন বল্‌লে—"আমার মৃত্যুর পর আমার অধ্যুষিত অঞ্চল যখন আবার লোকজনে পূর্ণ হ'বে, তখন আমার নাম অনুসারে যেন তা প্রসিদ্ধি লাভ করে।"

বিষ্ণু বল্‌লেন—"আচ্ছা।"

তখন আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো

সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুচক্রও তঞ্জনের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেল্‌লো।

এই ঘটনার বহুদিন পরে ঐ অঞ্চল আবার যখন জনপদে পরিণত হলো তখন বিষ্ণুর বরে তার নাম হলো—তঞ্জন এবং সেই তঞ্জন শব্দই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে—অবশেষে হ'য়ে দাঁড়ালো তাঞ্জোর। আজকালকার 'তাঞ্জোর' নাম সেই 'তঞ্জন' শব্দেরই অপভ্রংশ।...

—দুই—

তঞ্জনের এক ছেলে ছিলো—নাম তার ত্রিশিরা। ত্রিশিরা ছিলো বাপ্‌কা বেটা! শক্তিতেই বলো, আর অত্যাচারেই বলো—বাপের চেয়ে সে কোন অংশে কম ছিলো না—বরং বাপের উপরেই যেতো সে। তার বাসস্থান ছিলো ঐ অঞ্চলের আর একটা বনে।

বাপের মৃত্যুর খবর যখন সে শুন্‌লো, তখন ক্ষোভে, উত্তেজনায়, রাগে সে যেন পাগলই হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু স্বয়ং বিষ্ণু তার পিতৃহন্তা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে কোন

লাভ ত নেই—উপরন্তু তাঁর চক্রের মুখে নিজের মাথাটিও রেখে আস্‌তে হ'বে। সুতরাং ত্রিশিরা সেদিকও মাড়ালো না।

আর কোনরূপে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে না পেরে—অবশেষে সে বাপের মতই উপদ্রব সুরু কর্‌লো। বাপরে বাপ্! সে কী ভীষণ অত্যাচার! যেন সে পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্য শেষ কর্‌তে উঠে-প'ড়ে লেগে গেছে।

তেমন নিষ্ঠুর প্রাণিহত্যা চোখে দেখা ত দূরের কথা, কেউ কোন দিন কল্পনা কর্‌তেও পারে নি। মানুষের উপরই তার আক্রোশ বেশি।

উপদ্রুত ও অত্যাচারিত মানবগণ সকলে মিলে যাগ-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রে রাক্ষস-বিনাশের জন্য দেবতাদের আহ্বান কর্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু আহূত দেবতারা তাঁদের অক্ষমতা জানিয়ে দৈববাণী কর্‌লেন—'ত্রিশিরাকে নাশ করা আমাদের সাধ্যাতীত। যেহেতু তার প্রতি দেবাদিদেব মহাদেবের বর আছে যে, তাঁর শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি তাকে পরাজিত বা নিহত কর্‌তে পার্‌বে না।'

তখন সকলে চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লো। তাই ত কি করা যায়? ত্রিশিরার উপদ্রবে, গ্রামের পর গ্রাম—নগরের পর নগর যে একেবারে মরুভূমি হ'য়ে উঠ্‌লো। রাক্ষসের অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা কর্‌বার কি তবে আর কোন উপায়ই নেই?

এদিকে কিন্তু তখন বেশ একটা মজার কাণ্ড ঘটে গেলো।

তোমরা কার্ত্তিকেয়ের নাম অবশ্যই শুনেছো এবং পূজার সময় তাঁর মূর্ত্তিও নিশ্চয়ই দেখেছো। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র এবং স্বর্গের দেব-সেনাপতি। তিনি মহাবীর এবং মহাশক্তিমান্। দুর্দ্দান্ত এবং অত্যাচারী তারকাসুরকে বিনাশ ক'রে ত্রিভুবনে শান্তি স্থাপন কর্‌বার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছিলো। বড় হ'য়ে তোমরা যখন তাঁর জন্ম-ইতিহাস পড়্‌বে—তখন বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় তোমাদের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

ত্রিশিরার অত্যাচারে দেশ যখন যায় যায়, তখন দেব-সেনাপতি মহাবীর কার্ত্তিকেয় স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে এসে মানুষের ছদ্মবেশে, নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তিনি হঠাৎ একদিন ত্রিশিরার উপদ্রুত অঞ্চলে উপস্থিত হ'লেন। তখন বেলা শেষ; সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাবার উপক্রম কর্‌ছেন! ত্রিশিরা সারাদিন ধ'রে অসংখ্য প্রাণিহত্যা কর্‌বার আশায় রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় বসেছিলো।

সহসা মানুষরূপধারী দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে দেখে সে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লো এবং দিনশেষে চমৎকার একটা শিকার জুটেছে মনে ক'রে, হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে তার বিশাল

শরীর নিয়ে কার্ত্তিকেয়ের পথ আগ্‌লে বল্‌লে—"আর যাবে কোথায় ?"

ঘুরে ঘুরে সেই তল্লাটে পা দিয়েই কার্ত্তিকেয় ত্রিশিরার নাম এবং তার অত্যাচারের কথা শুন্‌লেন। এক্ষণে এক বিরাট ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে সামনে উপস্থিত হ'তে দেখেই তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন—পথরোধকারী রাক্ষস ত্রিশিরা ছাড়া আর কেউ নয়।

তিনি প্রথমে বেশ ভাল ক'রেই বল্‌লেন—"দেখ, ত্রিশিরা, তুমি অনেক নিরীহ মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণনাশ করেছো। আর এখন আমাকেও হত্যা কর্‌তে এসেছো। কিন্তু যদি কল্যাণ চাও এবার থেকে এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড হ'তে ক্ষান্ত হও। নচেৎ—"

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বিকট অট্টহাস্যে চারদিক কাঁপিয়ে ত্রিশিরা ব'লে উঠ্‌লো—"তুই কে-রে ? তোর মত এমন কত মানুষ যে এই পেটে হজম হ'য়ে গেছে! কোন্ সাহসে তুই আমায় ভয় দেখাস্ ?"—বল্‌তে বল্‌তে সে মুখ ব্যাদান ক'রে কার্ত্তিকেয়কে গ্রাস কর্‌তে গেলো।

অমনি কার্ত্তিকেয় প্রচণ্ড শক্তিতে ত্রিশিরার টুঁটি টিপে ধ'রে বল্‌লেন—"তবে রে অত্যাচারী রাক্ষস, আজ তোর অত্যাচারের শেষ কর্‌বো।"

বলা বাহুল্য ত্রিশিরার শরীরেও শক্তি কম ছিলো না। সেও পাল্‌টে কার্ত্তিকেয়ের টুটিটি টিপে ধ'রে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'জনে বাঁধ্‌লো ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি। দু'জনের দাপাদাপি আর লাফালাফিতে মাটি কেঁপে উঠ্‌তে

লাগ্‌লো। উভয়ের দেহই ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে অজস্র রক্তধারা ছুট্‌তে লাগ্‌লো।

অবশেষে দুরন্ত রাক্ষসকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর ব'সে মহাবীর কার্ত্তিকেয় বল্‌লেন—"ওরে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস, আর তোর রক্ষা নেই। বিধাতা তোর বিনাশের জন্যই আজ তোকে

আমার সম্মুখে ফেলে দিয়েছেন।”—বল্‌তে বল্‌তে তিনি ত্রিশিরার মুখে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত কর্‌তে লাগ্‌লেন।

যন্ত্রণায় বিকট আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে ত্রিশিরা প্রাণত্যাগ কর্‌লো।

কার্ত্তিকেয় আর বিলম্ব না ক'রে ত্রিশিরার মৃতদেহটাকে টেনে দূরে ফেলে দিয়ে, দেবলোকে চ'লে গেলেন।……

পরদিন সকাল হ'তে—ত্রিশিরার বিরাট মৃতদেহ পথের পাশে প'ড়ে থাক্‌তে দেখে, সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌লো—'তাই ত, একে হত্যা কর্‌লে কে? এত বড় বীরও পৃথিবীতে ছিলো নাকি?'

অনেকে ভয়ে তার মৃতদেহের কাছেও এগিয়ে যেতে পার্‌ছিলো না—কি জানি রাক্ষসটা যদি ছল ক'রে মরার মত প'ড়ে থেকে থাকে!

হঠাৎ দৈববাণী হলো—,ত্রিশিরা নিহত হয়েছে। দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এই রাক্ষসকে নিধন করেছেন।'

দৈববাণী শুনে সকলে পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত ক'রে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌লো—“জয় দেব-সেনাপতি মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের জয়!”

এর বহুদিন পরে, ত্রিশিরা যেখানে কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক নিহত

হয়েছিলো—সেখানে গ'ড়ে উঠ্‌লো এক নগর এবং ত্রিশিরার নাম অনুসারেই তার নাম হলো 'ত্রিশিরাপ[illegible]

সেই 'ত্রিশিরাপল্লীই' ক্রমশঃ লোকের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে হ'য়ে আজকাল ত্রিচিনপল্লী নামে অভিহিত হচ্ছে। কার্ত্তিকেয়ের বীরত্ব ও জন-হিতৈষণার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এখনও ঐ অঞ্চলে প্রতিবৎসরই 'সুব্রহ্মণ্যদেব' নামে মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের পূজা হ'য়ে থাকে।

রা[illegible]নহুষের কর্ম্মফল

মানুষের উন্নতি এবং অবনতি যে তার কর্ম্মের উপরই নির্ভর করে,—রাজা নহুষের উপাখ্যান পড়্‌লেই তা তোমরা বেশ ভালভাবেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

নহুষ ছিলেন পুরাকালের একজন সুপ্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি যেমন শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন, আবার তেমনি পুণ্যশীল ছিলেন। তুণ্ড নামক এক ভীষণ দুর্ব্বৃত্ত এবং মহাশক্তিশালী দৈত্যকে বিনাশ ক'রে তিনি ত্রিভুবনের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুশাসনে দেশে দস্যুভয় পর্য্যন্ত ছিলো না। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়েও তিনি থাক্‌তেন সন্ন্যাসীর মত এবং কঠোর যোগাভ্যাসের দ্বারা তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গণকেও সম্পূর্ণরূপে জয় করেছিলেন।

একবার স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হঠাৎ উত্তেজনা-বশে অযথা এক ব্রাহ্মণকে বধ ক'রে ফেলেন। শেষে কিন্তু তিনি অতিশয় অনুতপ্ত হ'ন। এমন কি সেই অন্যায় কার্য্যের জন্য তিনি এতদূর লজ্জিত হ'য়ে পড়েন যে, দেব-সমাজে মুখ দেখাতে না পেরে, স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে চ'লে যান।

কিন্তু স্বর্গ-সিংহাসন শূন্য প'ড়ে থাক্‌লে, ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যেহেতু, পুরাণের মতে স্বর্গের রাজাই মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, আগুন প্রভৃতির কর্ত্তা এবং নিয়ন্তা। কাজেই ইন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগেও ত্রিভুবনের মধ্যে দারুণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো।

দেবতারা সকলে মিলে সভা ক'রে স্থির কর্‌লেন,—যতদিন ইন্দ্র ফিরে না আসেন, ততদিনের জন্য অন্য কাউকে রাজা নির্ব্বাচিত ক'রে স্বর্গের সিংহাসনে বসাতে হ'বে।

কিন্তু তেমন উপযুক্ত ব্যক্তি কই? ইন্দ্রের মত তপস্যা-সিদ্ধ, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শৌর্য্যবীর্য্যবান পুণ্যাত্মা দেবতাদের মধ্যে আর কে আছে? অবশ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর,—এই তিনজন শ্রেষ্ঠ দেবতার কথা স্বতন্ত্র; তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ আছে। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, মহেশ্বর ধ্বংস করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ স্বর্গের রাজা হ'লে, তাঁর কাজ আবার কর্‌বে কে?

সুতরাং দেবতারা পড়্‌লেন বিষম সমস্যায়। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁরা স্থির কর্‌লেন,—যখন দেবলোকে তেমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মর্ত্ত্যলোক কিংবা পাতাল থেকে কাউকে রাজা নির্ব্বাচিত ক'রে অস্থায়িভাবে স্বর্গের সিংহাসনে বসানো হোক্।

মর্ত্ত্যে বাস করে মানুষ—আর পাতালে বাস করে দৈত্য। মানুষ ও দৈত্যগণের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেবসভায় উঠ্‌লো বটে, কিন্তু কারও যোগ্যতা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইন্দ্রের উপযুক্ত ব'লে স্বীকৃত হলো না।

পরিশেষে নাম উঠ্‌লো রাজা নহুষের। উঠ্‌তেই সেখানে যেন একটা মহা সোরগোল প'ড়ে গেলো।

কেউ বল্‌লেন—"ঠিক, ঠিক, রাজা নহুষ দেবরাজ ইন্দ্রের মতই শক্তিশালী।"

কেউ বল্‌লেন—"তপোবল এবং শাসন-ক্ষমতাও তাঁর ইন্দ্রের সমান।"

কেউ বল্‌লেন—"অবিরত বহু সৎকার্য্য ক'রে তিনি পুণ্যও অর্জ্জন করেছেন যথেষ্ট। এরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তি মানুষ হ'লেও স্বর্গের সিংহাসনে বস্‌বার অতি উপযুক্ত পাত্র। তা' ছাড়া, যোগাভ্যাসের দ্বারা তিনি যথেষ্ট আত্মশুদ্ধি এবং আত্মসংযমও লাভ করেছেন।"

আবার কেউ বল্‌লেন—"রণ-শাস্ত্রেও তাঁর মত সুপণ্ডিত আর দেখা যায় না। দেবারিগণ তাঁর প্রতাপে অবিরতই মাথা নত ক'রে থাক্‌বে।"

সুতরাং সকলের মতে রাজা নহুষই স্বর্গ-সিংহাসনে বস্‌বার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব'লে সাব্যস্ত হ'লেন।

যথাসময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের পুষ্পক রথসহ দেবদূত মর্ত্ত্যে এসে রাজা নহুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লেন।

নহুষ প্রথমে ভাব্‌লেন—'ব্যাপার কি? দেবরাজের রথ নিয়ে দেবদূত এখানে এলেন কেন?' কিন্তু পরে দেবদূতের মুখে যখন তিনি সমস্তই শুন্‌লেন, তখন যুগপৎ আনন্দে এবং বিস্ময়ে তিনি প্রথমটা যেন আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লেন।
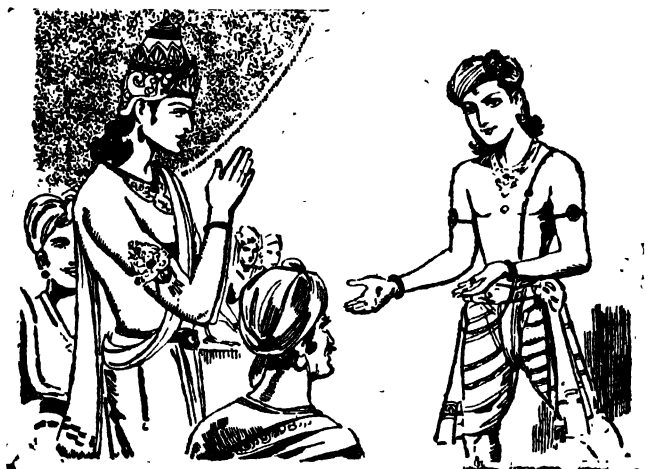
তারপর একটু সাম্‌লে নিয়ে বিনীতভাবে বল্‌লেন—"দেবদূত, দেবতাদের অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হয়েছি। ত্রিভুবনের মধ্যে আরও অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি থাক্‌তে, দেবতারা যে আমাকে তাঁদের রাজা নির্ব্বাচন করেছেন—এ আমার যোগ্যতার

জন্যে নয়—আমার প্রতি তাঁদের অসীম স্নেহই এর কারণ। যাই হোক, তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করা আমার সাধ্যাতীত; তাঁরা সকলে মিলে আমার উপর যে গুরুভার অর্পণ করেছেন, আমি তা বহন কর্‌বার উপযুক্ত না হ'লেও প্রাণপণে তাঁদের তুষ্টি বিধান কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো।"

দেবদূত উত্তর কর্‌লেন—"আপনার স্বর্গরাজ্যের সিংহাসন লাভ আপনার সৎকর্ম্মেরই ফল। যে যেমন কার্য্য করে, সে ফলও ভোগ করে তেমন।"

অতঃপর নহুষ পাত্রমিত্রদের সকলকে ডেকে, পুত্রের হাতে স্বীয় রাজ্যের ভার দিয়ে, ইন্দ্রের রথে চ'ড়ে স্বর্গে গমন কর্‌লেন।

তখন নহুষের নামে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধন্য ধন্য প'ড়ে গেলো! পড়্‌বারই কথা। যে সিংহাসনে বস্‌বার উপযুক্ত রাজা দেবলোকেও দুর্ল্লভ হলো, মানুষ হ'য়ে নহুষ তার সম্পূর্ণ যোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'লেন! এ শুধু নহুষেরই গৌরব নয়—এ সমগ্র নরলোকের এবং বিশ্বের সকল মানুষেরই গৌরব। রাজা নহুষ আজ প্রমাণ ক'রে দিলেন, কর্ম্মবলে মানুষ শুধু দেবতাই নয়—দেবতাদের অধিপতিও হ'তে পারে।

স্বর্গে দেবতারাও নহুষকে মহাসম্মানে এবং পরম সমাদরে বরণ ক'রে নিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মী এসে তাঁর

কপালে রাজটীকা দিয়ে গেলেন। যম, বরুণ, শনি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় দেবতারা তাঁর আনুগত্য-স্বীকারের শপথ গ্রহণ কর্‌লেন। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এসে তাঁর মস্তকে আশীর্ব্বাদের মাল্য দান কর্‌লেন। তখন চারদিক মুখরিত ক'রে ধ্বনিত হলো—"জয় দেবরাজ মহামতি নহুষের জয়!"

পবনের সাহায্যে ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই সংবাদ প্রচারিত হলো,—'দেবাধিপতি ইন্দ্রের স্থলে মহারাজ নহুষ স্বর্গের শাসনভার গ্রহণ করেছেন।'

তারপর নহুষ অপ্রতিহত প্রতাপে স্বর্গে রাজত্ব কর্‌তে লাগ্‌লেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কৃতিত্বের খ্যাতি দিগ্‌-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়্‌লো।

কিন্তু এতটা উপরে উঠে নহুষ যেন নিজকে সাম্‌লাতে পার্‌লেন না। মর্ত্ত্যের ঐশ্বর্য্য, আর স্বর্গের ঐশ্বর্য্য—দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। নহুষ সাধনার বলে মর্ত্ত্যের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লেও স্বর্গের বিপুল ও অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বীয় পদের অমর্য্যাদা করতে আরম্ভ কর্‌লেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁর ত্রুটী-বিচ্যুতিও ঘট্‌তে লাগ্‌লো।

আজ তিনি স্বর্গের রাজা,—ত্রিদিবের অধিপতি,—অধিকার তাঁর অপরিমেয়,—ঐশ্বর্য্য তাঁর অফুরন্ত,—শক্তি তাঁর দুর্ব্বার

ও দুর্জ্জয়। ইচ্ছা তাঁর অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীন। সব মিলে তাঁকে ক্রমশঃই মদ-গর্ব্বিত ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

নহুষ আত্মসংযম হারিয়ে ফেল্‌লেন। ব্যবহারে তাঁর পূর্ব্বের মত অমায়িকতা, পূর্ব্বের মত সৌজন্য আর থাক্‌লো না। বিচারাসনে ব'সে তিনি ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। অনেক সময় লঘুগুরু জ্ঞানহারা হ'য়ে তিনি দেবতাদের সম্মান এবং স্বাধীনতার উপরও আঘাত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

দেবতারা আশ্চর্য্য হ'য়ে ক্ষুণ্ণমনে ভাব্‌লেন—'এ হ'লো কি? রাজা নহুষের এরূপ মতিচ্ছন্ন ঘট্‌বে, এ যে কল্পনা করাও কঠিন ছিল।'

কিন্তু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌লেও প্রকাশ্যে তাঁরা কোন প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌লেন না। আর ক'রেই বা লাভ কি? ক্ষমতা এখন নহুষের হাতে। সকলে মিলে ক্ষমতা দিয়ে যাকে একবার বড় ক'রে তোলা যায়, তাঁর অধিকার ত বড় সহজে কেড়ে নেওয়া যায় না! সকলের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষমতার দর্পে তিনি সকলকে ভুলে গিয়ে, ন্যায়ই করুন, আর অন্যায়ই করুন, শাসনদণ্ড যতক্ষণ তাঁর হাতে থাকবে, ততক্ষণ তা বরদাস্ত ক'রে যেতেই হ'বে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নহুষ ঘোর অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌লেন এবং একদিন নিতান্ত মোহান্ধ হ'য়ে আদেশ দিয়ে বস্‌লেন—"আজ থেকে মুনি-ঋষিদের আমার শিবিকা বহন কর্‌তে হ'বে।"

আদেশ প্রচার হ'তেই দেবতাদের সকলের বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌লো! কি ভয়ানক! মুনি-ঋষিরা যে স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরও শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র। তাঁদের দিয়ে শিবিকা বহালে ধর্ম্ম ব'লে কি কিছু আর থাক্‌বে? তাছাড়া ত্রিদিবের শাসনকর্ত্তা নিজেই যদি এরূপ অন্যায় আচরণ করেন,—তবে জগতে লোক-শিক্ষা প্রচার কর্‌বে কে? না, না, এ অতি অন্যায়, ভীষণ গর্হিত!

তাঁরা এবার আর স্থির থাকতে না পেরে, একযোগে প্রতিবাদ কর্‌লেন;—বল্‌লেন—"মহারাজ নহুষ, বহু পুণ্যফলে মানুষ হ'য়েও আপনি আজ দেবতাদের অধীশ্বর! কিন্তু ক্রমশঃই আপনি আপনার আসনের যেরূপ অমর্য্যাদা কর্‌তে সুরু করেছেন, তাতে আপনার পরিণাম সম্বন্ধে আমরা সত্যিই শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছি! আপনি সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তিতে শক্তিমান্‌, সকলের শক্তিই আপনাকে এক অখণ্ড বিরাট শক্তিতে পরিণত করেছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি যদি এমন কোন আচরণ করেন, যাতে দেবতারা ক্ষুণ্ণ হন,—তা হ'লে আপনার শক্তির

অখণ্ডতা আর থাকবেনা—ফলে, আপনার আসনও নেমে যাবে অনেক নীচে। মুনি-ঋষিরা সকলের পূজ্য এবং শ্রদ্ধার পাত্র আপনি তাঁদের প্রতি যে আদেশ প্রচার করেছেন, অবিলম্বে তা' প্রত্যাহার করুন—নচেৎ পরে এর জন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হ'বে।"

কিন্তু নহুষ দেবতাদের কথা আদৌ গ্রাহ্য কর্‌লেন না। তখন তাঁর মতিচ্ছন্ন ঘটেছে, সুযুক্তি ভাল লাগ্‌বে কেন? তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে, সত্যসত্যই মুনি-ঋষিদের দিয়ে তার শিবিকা বহাতে আরম্ভ কর্‌লেন।

বলা বাহুল্য, মুনি-ঋষিদের অন্তরে এতে দারুণ আঘাত লাগ্‌লো, এবং তাঁরা নিজেদের যথেষ্ট অপমানিত জ্ঞান কর্‌লেন। কারো কারো অন্তরে উত্তেজনাও জেগে উঠ্‌লো দারুণ। কিন্তু রাগের বশে কিছু ক'রে ফেল্‌লে তাদের না কি পুণ্যফল কমে যায়; তাই তাঁরা অতি কষ্টে নিজেদের সংযত ক'রে নহুষের আদেশ পালন করতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে। নহুষের দুর্ব্যবহার ক্রমশঃই মুনি-ঋষিদের অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

হ'বারই কথা। যাঁরা বেদ বেদান্ত উপনিষদের স্রষ্টা, যাঁরা যাগযজ্ঞের হোতা—যাঁরা ত্রিকালজ্ঞ, এবং যাঁদের চিন্তাধারা জগতে অমূল্য জ্ঞান ও নীতি প্রচার ক'রে মানব সমাজের পরম

কল্যাণ সাধন করেছে—তাঁরা হ'লেন কিনা শিবিকার বাহক! এর চেয়ে তাঁদের প্রতি অত্যাচার আর কি হ'তে পারে?

একদিন নহুষ শিবিকারোহণ ক'রে একটা গভীর বনের ভিতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। শিবিকাবহনকারীদের মধ্যে মহর্ষি অগস্ত্যও সেদিন ছিলেন। হঠাৎ রাজা নহুষ ব'লে

উঠ্লেন—"না, মুনিঋষিগুলো কোন কর্ম্মেরই নয়। আটজন মিলে একটা লোককে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে,—তবু যেন ওদের পা নড়্ছেনা। যত সব অকর্ম্মণ্যের দল।"

কথাটা অগস্ত্যের বুকে দারুণ ভাবেই আঘাত কর্লো। তিনি উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে উঠ্লেন; এবং নিজকে আর

সংযত কর্‌তে না পেরে, শিবিকা ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে ব'ল্‌লেন—"মহারাজ নহুষ, তুমি স্বর্গ-সিংহাসনে ব'সে, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে পশুরও নীচে নেমে গেছ। এবার তোমাকে তোমার হীন কার্য্যের সমুচিত ফল ভোগ ক'র্‌তে হ'বে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, এই বনে তুমি ভীষণ অজগর সর্প হ'য়ে পথের পাশে প'ড়ে থাক্‌বে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে চ'লে যাবার শক্তি, তোমার থাক্‌বে না। জীবজন্তু হ'বে তোমার ভক্ষ্য। অথচ অবিরতই তোমার মনে জাগ্‌বে,—'কে তুমি,—এবং কোন্‌ পাপের ফলে সর্পে পরিণত হ'য়েছো'।

অভিশাপ শুনে নহুষের চৈতন্য হ'লো। তিনি জান্‌তেন যে, তপস্যাসিদ্ধ মুনিঋষিদের বাক্য ব্যর্থ হ'বার নয়। শঙ্কাকুল ভাবে তৎক্ষণাৎ শিবিকা থেকে নেমে, মহর্ষি অগস্ত্যের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—"মহর্ষি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। গর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে সত্যিই আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি। দয়া ক'রে আপনার অভিশাপ প্রত্যাহার করুন। আমি আপনার পা' ছুঁয়ে শপথ করছি,—আর কোনদিন কোনরূপ অন্যায় কর্‌বো না"—বল্‌তে বল্‌তে তিনি সত্য সত্যই অগস্ত্যের পা জড়িয়ে ধর্‌লেন।

মুনি-ঋষিরা যেমনি হঠাৎ রেগে উঠেন আবার চট্‌ ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে পড়েনও তেমনি। কিন্তু যে বাক্য তাঁদের মুখ

থেকে একবার বেরিয়ে পড়ে, তা'কে বিফল কর্‌বার শক্তি তাঁদেরও নেই।

নহুষের কাতরতায় দয়া পরবশ হ'য়ে অগস্ত্য ব'ল্‌লেন —"মহারাজ, আমি তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারি,— কিন্তু আমার অভিশাপ ব্যর্থ কর্‌তে পারিনা। সর্প তোমাকে হ'তেই হ'বে। [illegible] তোমার শাপমুক্তির জন্য আমি তোমাকে বরও দিচ্ছি। [illegible] কল্পবর্ষ পরে—সেই দ্বাপর যুগে তোমারই বংশে যুধিষ্ঠির নামে এক পরমধার্ম্মিক রাজা জন্মগ্রহণ কর্‌বেন। সত্য-পালনের জন্য তিনি এই দ্বৈতবনে আস্‌বেন। তাঁর দর্শনে তোমার শাপমুক্তি ঘট্‌বে। তখন তুমি সর্পদেহ পরিত্যাগ ক'রে স্বমূর্ত্তিতে পুনরায় স্বর্গলাভ করবে।"

নহুষ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন, বল্‌লেন—"উঃ, সে কতদিন!"

কিন্তু আর বেশিক্ষণ একে ভাব্‌তে হ'লোনা। সহসা তাঁর নিজের মূর্ত্তি লোপ পেয়ে গেলো; অগস্ত্যের কথামত তিনি এক বিরাট অজগর সর্পে পরিণত হ'য়ে পথের পাশে পড়ে থাক্‌লেন। সেইদিন থেকে তাঁর কাছ দিয়ে যে সব জীবজন্তু যেতে লাগ্‌লো, তারাই হ'লো তাঁর ভক্ষ্য।

হংস-ডিম্বক

রাজা ব্রহ্মদত্তের দুই ছেলে,—হংস ও ডিম্বক। যেমন হংস—তেমনি ডিম্বক। শক্তিতে তাদের যেন আর যোড়া মেলে না। আবার যুদ্ধ-বিদ্যাতেও তা'রা দু'জনেই অসাধারণ। তাদের দাপটে চারপাশের লোক যেন সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত! ..

কিন্তু তবুও তাদের মনে তৃপ্তি নেই। কি কর্‌লে আরও শক্তিশালী,—এমন কি সকলেরই অপরাজেয় হ'তে পারা যায়—এই চিন্তাই তা'রা দিনরাত ধরে কর্‌ছে।

একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত ছেলেদের ডেকে বল্‌লেন—"দেখ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উচ্চ হওয়াই ভাল; কিন্তু অতিশয় কিছুই ভাল নয়! ভগবান্ তোমাদের যে শক্তি দিয়েছেন—আর সেই শক্তি চর্চ্চা ক'রে তোমরা যে রকম রণ-নিপুণ হ'য়ে উঠেছ—তাকে তাচ্ছিল্য করা যায় না। আমার উপদেশ—তোমরা তার উপরই সন্তুষ্ট থেকে রাজ্যের ও প্রজার মঙ্গল সাধন কর্‌বার চেষ্টা কর।"

কিন্তু কি হংস কি ডিম্বক—কারোই বাপের কথা মনে ধর্‌লো না! দু'জনে একসঙ্গেই ব'লে উঠ্‌লো—"না, বাবা, আমাদের আরও শক্তিমান্ হ'তে হ'বে। তা ছাড়া জগতের

কেউই যেন আমাদের পরাজিত বা নিধন না কর্তে পারে,—এমন উপায়ও না ক'রে আমরা স্থির হ'তে পার্ছি না। আপনি বরঞ্চ ব'লে দিন্—কি কর্লে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হ'তে পারে।"

ছেলেদের দৃঢ়তা দেখে রাজা ব্রহ্মদত্ত বুঝ্লেন—তাদের নিরস্ত কর্বার চেষ্টা করা বৃথা। কাজেই একটু ভেবে তিনি বল্লেন—"দেখ, তোমরা দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা কর। তিনি আশুতোষ—সহজেই সন্তুষ্ট হ'বেন। তপস্যায় তাঁকে তুষ্ট ক'রে তোমরা মনোমত বর চেয়ে নেবে।"

হংস ও ডিম্বক দু'জনেই উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্লো। তারপর একটা ভাল দিন দেখে—তারা শিবের তপস্যা কর্তে চ'লে গেলো বহুদূরে—এক গভীর বনে—যেখানে জন-মানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

হংস ও ডিম্বকের কঠোর তপস্যায় শিবের আসন টল্লো। তিনি স্ব-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে দুই ভাইকে ডেকে বল্লেন—"তোমাদের তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি; বল, তোমরা কি বর চাও?"

আনন্দে অধীর হ'য়ে দুই ভাই হাত যোড় ক'রে বললে—"প্রভু, দয়া ক'রে এই বর দিন্—যেন আমাদের শক্তি দুর্জ্জয় হয়—আর আমরা যেন কারও বধ্য না হই।"

মৃদু হেসে "তথাস্তু" ব'লে মহাদেব নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন।

বর-লাভ ক'রে হংস ও ডিম্বক গর্ব্বে বুক উঁচু ক'রে বাড়ী ফিরে এলো।

তারপর আর কি ?...

হংস-ডিম্বককে আর পায় কে ? একে মা-মনসা, তায় ধূনার গন্ধ! এমনিই তো ওরা কাউকেই গ্রাহ্য করতো না; আবার শিবের বর পেয়ে অবধি ধরাকে যেন সরাজ্ঞানই করতে লাগলো।

উচিত-অনুচিতের বিচার নেই। লঘুগুরু জ্ঞান নেই, ওদের যা খুশী হয়—ওরা তাই ক'রে বেড়ায়। লোকের উপর অত্যাচার ক'রে ওরা মজা দেখে। যাঁরা সম্মানের পাত্র, তাঁদের যথেচ্ছ অপমান করে; পূজনীয় ব্যক্তিকেও অশ্রদ্ধা করতে ওরা এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না।

রাজ্যের বহু প্রজা, চারপাশের কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট এসে অভিযোগ করতে লাগ্‌লেন হংস ও ডিম্বকের বিরুদ্ধে।

বিশেষ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত পুত্রদের ডেকে বার বার সাবধান ক'রে দিলেন—তাদের অনেক উপদেশও দিলেন; কিন্তু হংস-ডিম্বক কোন কথায় কানই দিলে না। শক্তির গর্ব্বে ওরা ইচ্ছামতই শক্তির অপব্যবহার ক'রে যেতে লাগ্‌লো!

একদিন ওরা মহামুনি দুর্ব্বাসারও ঘোর অপমান করতে দ্বিধা কর্‌লো না। মানুষের ত কথাই নেই—দুর্ব্বাসা স্বর্গের দেবতাদেরও পূজনীয়; তপোবল তাঁর অসাধারণ! তাঁকে অসন্তুষ্ট বা হতমান ক'রে অনেকেরই সর্ব্বনাশ হয়েছে। শক্তির দর্পে এহেন দুর্ব্বাসাকেও ওরা নিতান্ত ইতরের মত অপমান ক'রে বস্‌লো!

দুর্ব্বাসা এক নির্জ্জন স্থানে ব'সে ভগবানের আরাধনা কর্‌ছিলেন—এমন সময় দুই ভাই হঠাৎ কোত্থেকে এসে টান মেরে ওঁর কৌপিন খুলে দিলে।

দুর্ব্বাসা ছিলেন ভয়ানক কোপন-স্বভাবের; হংস-ডিম্বকের অন্যায় কার্য্যে তিনি রেগেও উঠেছিলেন খুব এবং ইচ্ছা কর্‌লে অভিশাপ দিয়ে দুই ভাইয়ের ঘোর অনিষ্টও কর্‌তে পার্‌তেন তিনি। কিন্তু যে সময় তিনি ভগবানের আরাধনায় লিপ্ত, সে সময় নিজেকে সংযত ক'রে, অপমান সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি ?

তিনি কোন প্রতিবাদ না ক'রে চুপ ক'রে থাক্‌লেন। কিন্তু অপমানের জ্বালা তাঁর বুকে জ্বল্‌তেই লাগ্‌লো।

দিন কয়েক পরে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে হ'লো দুর্ব্বাসার দেখা। দেখা হ'তেই তিনি মনের খেদে ব'লে উঠ্‌লেন— "দেখুন দেবর্ষি, মুনি-ঋষিদের মানসম্মান আর থাকে না। ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের স্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে উঠেছে যে— তা'রা আমাদের যথেচ্ছ অপমান কর্‌তেও দ্বিধা বোধ করে না।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে নারদ জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"তার মানে ? কি হয়েছে মহর্ষি ?"

উত্তরে দুর্ব্বাসা হংস-ডিম্বক-কর্ত্তৃক তাঁর অপমানের কথা বল্‌লেন। বল্‌তে বল্‌তে ক্ষোভে-উত্তেজনায় তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়্‌লো।

অপমানের আঘাত যে দুর্ব্বাসার বুকে বড় গুরুতরভাবেই বেজেছে—তা বুঝ্‌তে নারদের বাকী থাক্‌লো না। তিনিও

ভেবে দেখ্‌লেন—সত্যই, এ ভারী অন্যায়! দুর্ব্বাসা সর্ব্বজন-মান্য ঋষি—তাঁকে যারা অপমান কর্‌তে পারে—তাদের দ্বারা এমন কোন গর্হিত কার্য্য নেই—যা সম্পন্ন হ'তে পারে না। এই উচ্ছৃঙ্খলতার দমন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য—এবং তা কর্‌তেই হ'বে।

মনে মনে এই রকম নানা কথা ভেবে নারদ উত্তর দিলেন—"আপনার অপমানের কথা শুনে সত্যিই মর্ম্মাহত হয়েছি। বিশেষ আজ যারা আপনাকে অপমানিত কর্‌তে পারে—কাল তা'রা আমাকে এবং অপরকেও অপমানিত কর্‌তে পারে। তা ছাড়া, আপনার অপমান—মুনিঋষিদের সকলেরই অপমান। যা হোক্, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওদের দমন কর্‌বার উপায় আমি শীগ্‌গীরই ক'রে ফেল্‌ছি। শক্তির দর্পে যারা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ন্যায় এবং সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তাদের ক্ষমা কর্‌লে বা প্রশ্রয় দিলে বিশ্বের অমঙ্গল সাধন করা হয়।"

নারদের কথায় দুর্ব্বাসা ভারী আনন্দিত হ'লেন। এমন কি অন্তরে যে অপমানের জ্বালা জ্বল্‌ছিল, তাও যেন কতকটা শান্ত হ'লো। মৃদু হেসে তিনি বল্‌লেন—"তা আপনি ইচ্ছে কর্‌লে, অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব কর্‌তে পারেন। ত্রিভুবনে এমন বহু ব্যাপারই ঘটেছে। তাছাড়া দেখুন, অত্যাচারীর যদি দমন না হয়, তা হ'লে পৃথিবী বড়ই অশান্তির স্থল হ'য়ে উঠে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ"—নারদ ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন, "সে-কথা খুবই ঠিক। যা হোক্, আপনি অধৈর্য্য হবেন না। আপনার অপমানের প্রতিকার আমি কর্‌বোই।"

"আপনাকে ধন্যবাদ"—ব'লেই দুর্ব্বাসা তখনকার মত নারদের কাছে বিদায় নিলেন।

নারদও মনে মনে নানা মতলব আঁট্‌তে আঁট্‌তে পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন।

তারপর নারদ একদিন রাজা ব্রহ্মদত্তের সভায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। পাত্রমিত্রসহ আসন ছেড়ে উঠে রাজা দেবর্ষিকে অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

দেবর্ষি আসন গ্রহণ ক'রে বল্‌লেন—"মহারাজের কুশল ত ?'

"আপনার আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল।"—প্রগাঢ় ভক্তিতে মাথা নত ক'রে ব্রহ্মদত্ত উত্তর দিলেন।

নারদ আবার বল্‌লেন—"মহারাজ, আপনি যথার্থই সৌভাগ্যবান্। বিশাল আপনার সাম্রাজ্য—অসীম আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি! কোটি-কোটি প্রজা আপনার জয়গান কর্‌ছে। তার উপর আপনার দুই পুত্র—হংস ও ডিম্বক অমিত বলশালী এবং অন্যের অবধ্য। ঐশ্বর্য্যে, শৌর্য্যে, মর্য্যাদায় এবং গৌরবে বর্ত্তমান ভারতে আপনার সমান রাজা আর নেই। সেই জন্যই মহারাজ—"

হঠাৎ নারদ থেমে গেলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন—"বলুন, বলুন দেবর্ষি, কি বল্‌তে চান। হঠাৎ থাম্‌লেন কেন?"

"না, থাম্‌বার কোন কারণ নেই।"—নারদ উত্তর কর্‌লেন—"এ আনন্দেরই কথা। আর তা বল্‌বার জন্যই আজ

আমি আপনার কাছে এসেছি। মহারাজের এখন রাজসূয় যজ্ঞ করা উচিত।"

রাজসূয় যজ্ঞ! সে এক বিরাট ব্যাপার! এই অনুষ্ঠানে দেশের বড়-ছোট সমস্ত রাজা নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসেন এবং নানাভাবে যজ্ঞসম্পাদনকারী রাজার অধীনতা

স্বীকার ক'রে তাঁকে সম্মান ও কর প্রদান করেন। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'লে সেই রাজা হন 'রাজ-চক্রবর্ত্তী'।

নারদের প্রস্তাব শুনে রাজা ব্রহ্মদত্ত একটু ভেবে উত্তর কর্‌লেন—"তাই ত দেবর্ষি, সে বিরাট যজ্ঞের অধিকারী কি আমি হয়েছি?"

"নিশ্চয়ই হয়েছেন।"—নারদ দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লেন, বর্ত্তমান ভারতে ঐ যজ্ঞ কর্‌বার যদি কারও অধিকার থাকে—তবে সে আপনারই। আপনার দুই পুত্রই অসাধারণ বীর, তাদের প্রতাপে এবং প্রভাবে আপনার আহ্বান এবং আদেশ উপেক্ষা কর্‌বার মত সাহস দেশে কোন রাজারই নেই। আপনি কোনরূপ দ্বিধা না ক'রে, যজ্ঞের আয়োজন কর্‌তে আরম্ভ করুন।"

রাজা ব্রহ্মদত্ত তবুও যেন ভরসা পেলেন না; বল্‌লেন—"আচ্ছা দেবর্ষি, আমার ছেলেদের যদি সম্মতি পাই—আপনার আদেশমত কাজ কর্‌তে আর কোন দ্বিধা কর্‌বো না।"

নারদ ভাব্‌লেন—'আর চিন্তা নেই। হংস-ডিম্বক যেমন গর্ব্বিত, তেমনি উদ্ধত। রাজা যদি তাদের যুক্তি নিয়ে কাজ করেন, তবে নারদের কল্পনা একদিন বাস্তবে পরিণত হ'বেই।' সুতরাং তিনি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে বললেন—"বেশ, বেশ, ভাল কথা। উপযুক্ত পুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বেন বই কি?"

—"যাক্ আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। আবার শীগ্গির একদিন আস্বো।"

নারদ উঠে দাঁড়ালেন। রাজাও শশব্যস্তে আসন ছেড়ে উঠে যথারীতি শিষ্টাচারের সঙ্গে তাঁকে বিদায় দিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের কথা শুনেই ত হংস-ডিম্বক আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠ্লো। সোৎসাহেই তা'রা পিতাকে বল্লে —"ঠিক ঠিক। দেবর্ষি নারদ খুব সত্য কথাই বলেছেন, বাবা! আমরা থাক্তে সমগ্র ভারতে আপনাকে উপেক্ষা করে কে?"

পুত্রদের উত্তরে রাজা ব্রহ্মদত্তও উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্লেন। বড় হবার ইচ্ছা কার না হয়? সুতরাং রাজা ব্রহ্মদত্তের মনে রাজ-চক্রবর্ত্তী হবার আগ্রহ থাকা বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নয়। বরং অতি স্বাভাবিক! তবে যে এতক্ষণ তিনি ইতস্ততঃ কর্ছিলেন তা কেবল অত বড় একটা ব্যাপারে হঠাৎ নেমে পড়্তে সাহস পাচ্ছিলেন না ব'লেই।

অবিলম্বেই রাজসূয় যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'য়ে গেলো।

রাজা ব্রহ্মদত্ত ভারতের প্রত্যেক রাজার কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁদের কাছে কর দাবী কর্লেন এবং যজ্ঞকার্য্যে তাঁর সহায় হ'বার জন্য প্রত্যেককেই নিমন্ত্রণ কর্লেন।

বাস্তবিক রাজা ব্রহ্মদত্তের আহ্বান উপেক্ষা কর্তে কারোই সাহস হলো না। একে একে সমস্ত রাজাই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত

হ'য়ে তাঁকে যথারীতি কর প্রদান কর্‌লেন এবং রাজা ব্রহ্মদত্ত যাকে যে কাজের ভার দিলেন, তিনি অবনতমস্তকে তাই কর্‌তে রাজী হ'লেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে যজ্ঞস্থল লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেলো। কর্ম্ম-কোলাহলে এবং অসংখ্য লোকের উল্লাস-ধ্বনিতে রাজা ব্রহ্মদত্তের সমগ্র রাজধানীই যেন মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

অনেক মুনি-ঋষিও যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন; দেবর্ষি নারদও বাদ পড়েন নি।

নারদ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হ'য়ে সমস্ত দেখেশুনে আনন্দ প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—"মহারাজ ব্রহ্মদত্ত, আপনি ধন্য! আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তির নিদর্শন এই বিরাট যজ্ঞস্থল। সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গ আজ আপনার দ্বারে উপস্থিত এবং এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণতাই আপনাকে ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি ব'লে স্বীকার কর্‌ছে। তা দেশের সকল রাজাই এসেছেন ত?"

সবিনয়ে মাথা নত ক'রে ব্রহ্মদত্ত বল্‌লেন—"হাঁ, দেবর্ষি! এ বিরাট সাফল্য আপনারই আশীর্ব্বাদের ফল।"

"বেশ, বেশ, বড়ই আনন্দের কথা"—নারদ আবার বল্‌লেন,—"তা—হাঁ হাঁ, বেশ মনে পড়েছে। আপনি সকলের কাছেই কর পেয়েছেন ত? যদি কারো কাছ থেকে এখনও না পেয়ে থাকেন, শীগ্‌গির চেয়ে পাঠাতে হ'বে। কারণ এই

যজ্ঞের একটি বিশেষ নিয়ম হচ্ছে,—রাজাদের মধ্যে যতক্ষণ একজনও আপনাকে সার্ব্বভৌম নৃপতি ব'লে স্বীকার করতে *বাকী থাক্‌বেন, ততক্ষণ আপনি যজ্ঞে বস্‌বার অধিকারী হ'তে* পার্‌বেন না। তাই একবার ভাল ক'রে অনুসন্ধান করুন।"

রাজা ব্রহ্মদত্ত উত্তর কর্‌লেন—"না দেবর্ষি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। প্রত্যেক রাজাই আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে এখানে এসেছেন এবং প্রত্যেকেই কর দিয়ে আমাকে বড় ব'লে স্বীকার করেছেন।"

"বেশ, বেশ"—বলেই নারদ একবার চারদিক ঘুরে ফিরে এসে ভ্রূকুটি ক'রে বল্‌লেন—"কই, দ্বারকার ত কাউকে দেখ্‌তে পেলেম না! শ্রীকৃষ্ণের কাছে কর পাওয়া গেছে ত?"

দ্বারকাপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্রহ্মদত্তের দূত গিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি বা তাঁর কোন প্রতিনিধি যজ্ঞস্থলে আসেন নি; অথবা সেখান থেকে কেউ কোন করও পাঠান নি। নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মদত্ত যেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়েই বল্‌লেন—"না দেবর্ষি, সেখানকার খবর ত কই কিছু পাওয়া যায় নি।"

নারদ আবার ভ্রূকুটি ক'রে বল্‌লেন—"তবে কি ক'রে আপনার যজ্ঞ সমাধা হ'তে পারে? শ্রীকৃষ্ণ না আসুন—তাঁর কাছ থেকে কর ত পেতেই হ'বে। তা যাই হোক—সেখানে আবার দূত পাঠিয়ে কর্ চেয়ে পাঠান।"

ব্রহ্মদত্ত আর করেন কি? কাজ যখন আরম্ভই করেছেন, তখন তার আয়োজন তো সম্পূর্ণ করতে হ'বে? তিনি তৎক্ষণাৎ একজন দূতকে আবার দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু মুস্কিল করলো ঐখানেই। শ্রীকৃষ্ণ ত এলেনই না অপরন্তু দূতকে ব'লে দিলেন—"আমি কাউকেও কর দেবো না এবং দেবারও কোন হেতু নেই।"

দূত ফিরে এসে সকলের সামনে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতেই হংস ও ডিম্বক ভীষণ চটে উঠলো। রাগে অধীর হ'য়ে তা'রা বললেন—"কি কৃষ্ণের এত বড় স্পর্দ্ধা, রাজা ব্রহ্মদত্তকে উপেক্ষা করে!...আচ্ছা, এক্ষুনি আমরা সেখানে যাচ্ছি; কর না দেয়, তাকে বন্দী ক'রে এখানে নিয়ে আসবো।"

বলতে বলতে তা'রা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে, অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দ্বারকার অভিমুখে বেরিয়ে পড়লো।

নারদ তখন মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে ব্রহ্মদত্তের দিকে চেয়ে বললেন—"ব্যস, আবার কি? আপনার হংস-ডিম্বক যখন গেছে. তখন সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ব্রহ্মদত্ত কোন জবাব দিলেন না।

দ্বারকার তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে হংস-ডিম্বক দূত পাঠিয়ে সদম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে ব'লে পাঠালেন—"রাজা ব্রহ্মদত্ত আজ বিশাল ভারতের একমাত্র সার্ব্বভৌম নরপতি। তাঁর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে এবং তাঁর নিকট যথারীতি কর না পাঠিয়ে, কৃষ্ণ যে গুরুতর অপরাধ করেছেন, তার মার্জ্জনা নেই। তবুও তিনি যদি স্বয়ং আমাদের কাছে এসে কর দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন —আমরা সন্তুষ্ট হ'বো।"

দূতের মুখে হংস-ডিম্বকের দর্পিত উক্তি শুনে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে হো-হো ক'রে হেসে উঠ্লেন; তারপর দূতকে বল্লেন —"তোমার প্রভুদের বলো কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের দ্বারকা কারও অধীন নয়। উপরন্তু সমগ্র ভারত দ্বারকার রাজশক্তির সম্মান ক'রে চলে। হংস-ডিম্বকের যদি শক্তি থাকে—আমার কাছে জোর ক'রে কর আদায় ক'রে নিয়ে যাক।"

দূত ফিরে এসে হংস-ডিম্বকের কাছে সমস্তই বল্লো। শুনেই ত দুই ভাই রেগে আগুন! ক্রুদ্ধস্বরে তৎক্ষণাৎ তা'রা সৈন্যদের হুকুম ক'র্লে—"আক্রমণ কর, এই দণ্ডেই দ্বারকা আক্রমণ কর। আজ কৃষ্ণের কি তার দ্বারকার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখ্বে না।"

সঙ্গে সঙ্গে রণ-দামামা বেজে উঠ্লো। হংস-ডিম্বকের বিরাট বাহিনী দ্বারকানগরীর চারদিক ঘিরে ফেল্লো।

শ্রীকৃষ্ণ দেখ্‌লেন—আর নীরব থাক্‌লে চল্‌বে না। গর্বোন্মত্ত হংস-ডিম্বকের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে হ'বে।

সেনাপতি হ'য়ে তিনি নিজে দ্বারকার সৈন্যদের আদেশ দিলেন—"চালাও যুদ্ধ।"

অনেকক্ষণ ধ'রে যুদ্ধ চল্‌লো। দুই পক্ষই সমান—কেউ কারও কম যায় না; সুতরাং হারজিতও হয় না। সৈন্যদের হানাহানি, দাপাদাপি, অস্ত্রশস্ত্রের প্রচণ্ড নির্ঘোষ ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে হংসে এবং শ্রীকৃষ্ণে দ্বৈরথ সমর বেধে গেলো; যেন দুই মহাবল সিংহ একে অন্যকে বিনাশ কর্‌বার জন্য প্রমত্ত হ'য়ে উঠেছে!

শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য জান্‌তেন যে, হংস-ডিম্বক শিবের বরে অন্যের অবধ্য। কিন্তু নিজে অবধ্য হ'লেই যে কেউ অপরকে পরাজয় বা নিধন কর্‌তে পার্‌বে, এমন কোন কথা নেই। তা'ছাড়া অন্যে ওদের নিধন কর্‌তে না পারুক, পরাজয়ও যে কর্‌তে পার্‌বে না—তারই বা মানে কি? শিবের বরে ওরা দুর্জ্জয় বটে, কিন্তু অপরাজেয় নয়।

সুতরাং হংসকে পরাজিত কর্‌বার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ কর্‌তে লাগ্‌লেন—যার শক্তি, তেজ ও প্রচণ্ডতায় হংসকে শেষ পর্য্যন্ত ভারী বিব্রত হ'য়ে

উঠ্‌তে হ'লো। সেও নানারূপ ভীষণ অস্ত্রের প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র ব্যর্থ করবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু বেশিক্ষণ তা সম্ভব হ'লো না। শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রপূত অস্ত্র-সন্ধানে যখন একসঙ্গে একেবারে হাজার হাজার সুতীক্ষ্ণ শর হংসের উপর গিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব বাণের মুখে প্রচণ্ড আগুন জ্বলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, তখন প্রাণে মর্‌বার ভয় না থাক্‌লেও জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে সে রণস্থল ছেড়ে নিকটবর্ত্তী যমুনা নদীর দিকে ছুট্‌লো।

শ্রীকৃষ্ণও তার পিছু পিছু ছুট্‌লেন; আর তেমনই অস্ত্র প্রয়োগ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

অবশেষে আর সহ্য কর্‌তে বা সাম্‌লে উঠ্‌তে না পেরে, হংস যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে মার্‌লো ডুব।

শ্রীকৃষ্ণ দেখ্‌লেন—হংস কায়দার মধ্যেই পড়েছে। কিছুক্ষণ জলের ভিতর থেকে উঠ্‌তে না পার্‌লেই তাকে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে মরতে হ'বে। শিবের বরে অস্ত্রের আঘাতে সে না মরুক—জলে ডুবে মৃত্যু তার অনিবার্য্য! এই ভেবে শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ শর যমুনার বুকে নিক্ষেপ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এদিকে জলের মধ্যে থেকে হংসের দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। জল থেকে মাথা তুলে সে যতবার নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা কর্‌তে গেলো, ততবারই শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রের প্রভাবে তাকে ব্যর্থ হ'তে

হ'লো। এইভাবে ব্যর্থ হ'তে হ'তে পরিশেষে যমুনার গর্ভেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হ'য়ে গেলো।

অদূরে দাঁড়িয়ে এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড ব্যথায় ডিম্বকের দুই চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়্‌লো।
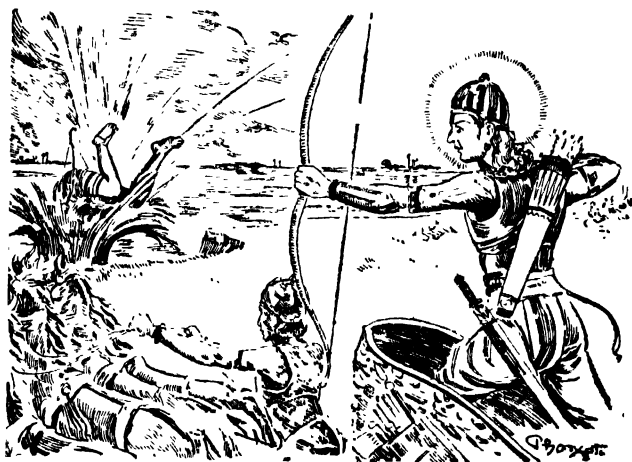
ভাই-ভাই তাদের ভালবাসা ছিলো অপরিমেয়! শোকের উত্তেজনায় সে অতি ভীষণভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ কর্‌লো।

কিন্তু কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি? কিছুক্ষণ পরে হংসের মতই বিব্রত ও অস্থির হ'য়ে সেও ঝাঁপ দিলো যমুনার বুকে; আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাকেও যেন আর উঠ্‌তে না হয়—সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌লেন।

সদম্ভে শ্রীকৃষ্ণের কাছে কর আদায় কর্‌তে এসে দুইটি ভাইকেই যমুনার অতল তলে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়্‌তে হ'লো।

সমস্ত সংবাদ পেয়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত পুত্রশোকে যেন জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়্‌লেন।

হংস ও ডিম্বকের দুরন্তপনায় যারা জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছিলো, তা'রা সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। সকলেই বল্‌লে—"দুষ্টের দমন হওয়াই মঙ্গল।"

নারদও মনে মনে বেজায় খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—"বাবা, এ নারদের চাল! ব্যর্থ হবার যো কি? ক্ষমতার অপব্যবহার কর্‌লে, পরিণাম এমনিই হয়!"

খবরটা যখন দুর্ব্বাসার কানে উঠ্‌লো, তখন তিনিও বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়ে নারদের বুদ্ধির তারিফ কর্‌তে লাগ্‌লেন। অপমানের যে তীব্র জ্বালা এতদিন ধরে তাঁর অন্তরে জ্বলছিলো—আজ যেন তা একেবারে নির্ব্বাপিত হয়ে গেলো।

অত্যাচারী হংস-ডিম্বকের মৃত্যুতে তাদের বাপ-মা ছাড়া, আর কেউই একবার 'আহা'ও বল্‌লে না!

প্রতর্দ্দনের সাধনা

কাশী বা বারাণসীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। কাশী ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত প্রাচীন নগর এবং হিন্দুদের পরম তীর্থস্থান। প্রবাদ আছে—এখানে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং বাস করেন।

পুরাকালে দিবোদাস নামে এক মহাপুণ্যশীল ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। গুণে, শীলে, শৌর্য্যবীর্য্যে তাঁর সমকক্ষ রাজা তখন অতিশয় বিরল ছিলো। সেইজন্য তিনি স্বর্গের দেবতাদেরও প্রীতি অর্জ্জন কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন।

একদিন রাজা দিবোদাস দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের কাছে, রাজধানী নির্ম্মাণ কর্‌বার উপযুক্ত একটি স্থান নির্ব্বাচন ক'রে দেবার জন্য প্রার্থনা করেন।

ইন্দ্র বল্লেন—"বরুণা ও অসী নদীর সঙ্গম-স্থলে আপনি একটি নগর নির্ম্মাণ করুন ; এমন চমৎকার স্থান আর নেই।"

দেবরাজের কথামত রাজা দিবোদাস অনেক লোকজন লাগিয়ে, অজস্র অর্থব্যয় ক'রে, রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, এবং বরুণা ও অসী নদীর নাম অনুসারে নগরের নাম রাখেন—"বারাণসী"।

রাজা দিবোদাসের আপ্রাণ চেষ্টায় এবং যথোচিত সুব্যবস্থায় বারাণসী ক্রমশঃই শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর্‌তে থাকে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রাজা দিবোদাস একাধারে পণ্ডিত, বীর, সুশাসক ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। প্রজারা তাঁর রাজত্বে পরম সুখেই বাস কর্‌তো এবং তাঁকে পিতার মতই ভক্তি কর্‌তো। রাজা দিবোদাসও প্রজাদের সুখশান্তির জন্য সর্ব্ববিধ সুবন্দোবস্ত কর্‌তে কোনদিনই কুণ্ঠিত হতেন না। তাই প্রজারা সকলেই চারদিকে তাঁর জয়গান ক'রে বেড়াতো।...তা'ছাড়া, অতিথির সৎকার, বিদ্বানের সমাদর, আর্ত্ত ও শরণাগতের রক্ষণ, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন প্রভৃতি রাজোচিত কার্য্যে তাঁর কীর্ত্তি-গাঁথা কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হ'য়ে তাঁকে সকলের কাছেই মহিমান্বিত ক'রে তুল্‌তো।

কিন্তু পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয় এমন লোকের অভাব জগতে কোনদিনই হয়নি।...রাজা দিবোদাসের অতুল

সৌভাগ্যও অন্যান্য অনেক রাজাকে ঈর্ষ্যান্বিত ক'রে তুল্‌লো। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাঁর অনিষ্ট সাধন কর্‌বার জন্যও উঠে পড়ে লেগে পড়্‌লেন।......

একদিন রাজা দিবোদাস রাজসভায় ব'সে পাত্রমিত্রদের সঙ্গে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় আলোচনা কর্‌ছেন—এমন

সময় রাজদূত সভাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে ব'ল্‌লেন—"মহারাজ, দারুণ বিপদ!"

"কেন, কেন, কি হ'য়েছে?"—রাজা দিবোদাস উদ্বিগ্ন হ'য়ে দূতকে প্রশ্ন কর্‌লেন। পাত্রমিত্রগণও উৎকণ্ঠিত ভাবে দূতের মুখের দিকে তাকালো।

দূত উত্তর দিলে—"মহারাজ, অসংখ্য হৈ-হয় সৈন্য হঠাৎ রাজধানীর চারদিক ঘিরে ফেলেছে।"

হৈ-হয় তখনকার একটি প্রবল প্রতাপ ক্ষত্রিয় রাজ-বংশের নাম। রাজা দিবোদাসের সৌভাগ্যে যাঁরা ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে উঠেছিলেন—হৈ-হয়-রাজ বীতহব্যই ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান।

বীতহব্যের পুত্র ছিলো একশত। তিনি নিজেও যেমন শক্তিশালী ও রণ-নিপুণ ছিলেন পুত্রেরাও প্রত্যেকে তেমনি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলো। রাজা দিবোদাসের রাজধানী বারাণসী নগরীর উপর তাঁদের লোভ ছিলো প্রচণ্ড। কি ক'রে দিবোদাসকে তাড়িয়ে বারাণসী অধিকার কর্তে পারা যায়—এই চিন্তায় তাঁরা সকলেই যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তাঁদের অভিসন্ধির বিষয় রাজা দিবোদাসের অজ্ঞাত ছিলো না।

কাজেই দূতের মুখে সংবাদ পেয়েই রাজা দিবোদাস, চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। পাত্রমিত্রদের পানে চেয়ে বল্‌লেন—"এই সব পররাজ্যলোভী, ঈর্ষ্যাতুর ব্যক্তিদের জন্যই জগতে নানা যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশান্তির সৃষ্টি হয়। হৈ-হয়দের রাজ্যের উপর আমার কোন লোভই নেই—তাদের কোন বিষয়ে আমি কোনদিন ঈর্ষ্যাও করি না—কিম্বা তাদের অনিষ্টের চিন্তাও আমার মনে স্থান

পায়না ; অথচ তারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট ক'র্‌তে চায়।...যাহোক্, এর সমুচিত শিক্ষা দিতে হ'বে।" বলেই, তিনি গম্ভীর স্বরে ডাক্‌লেন—"সেনাপতি !"

সেনাপতি রাজ-সভার মধ্যেই বসেছিলেন। রাজার আহ্বানে ব্যস্তভাবে উঠে তাঁর সাম্‌নে এসে অভিবাদন ক'রে ব'ল্‌লেন—"আদেশ করুন, মহারাজ !"

"এই দণ্ডেই বাহিনী সজ্জিত ক'রে হৈ-হয়দের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন।"—দৃপ্তকণ্ঠে রাজা দিবোদাস উত্তর কর্‌লেন—"আমাদের বাহুবল যে হৈ-হয়দের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—এর প্রমাণ দিতে হ'বে। কি বলেন আপনারা ? আপনাদের কি মত ?"—ব'লেই তিনি প্রশ্নপূর্ণ-নেত্রে পাত্রমিত্রদের দিকে চাইলেন।

পাত্রমিত্রগণ সমস্বরে বলে উঠ্‌লেন—"মহারাজ বীর, বীরের মত কথাই বলেছেন। রাজা বীতহব্যের স্পর্দ্ধা অসহ্য।"...

"এবং অমার্জ্জনীয়।"—সেনাপতি বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে সোৎসাহে বল্‌লেন—"মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি অবিলম্বেই বাহিনী সজ্জিত ক'রে হৈ-হয়দের কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল দেবার ব্যবস্থা কর্‌ছি।"—বলেই তিনি আর পলকমাত্র দেরী না ক'রে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজসভা কিছুক্ষণের জন্য নীরব ও নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলো।

তারপর দুই পক্ষে বাধ্‌লো ভীষণ যুদ্ধ। সে যুদ্ধের যেন আর বিরাম নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যেতে যেতে একটা বছরই ঘুরে গেলো; কিন্তু তবু আর সে যুদ্ধের শেষ হলোনা। স্বয়ং রাজা দিবোদাসও যুদ্ধে নেমে যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর সৈন্যগণও জয়লাভের জন্য যেন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে বস্‌লো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য!

যথেষ্ট বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েও রাজা দিবোদাসকে কিন্তু পরাজয় স্বীকার ক'র্‌তে হ'লো। জয়োল্লাসে উন্মত্ত হ'য়ে হৈ-হয়গণ হৈ-হৈ কর্‌তে কর্‌তে বারাণসীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লো।

রাজা দিবোদাস সস্ত্রীক তাঁর স্বহস্তে নির্ম্মিত বড় সাধের রাজধানী বারাণসী ত্যাগ ক'রে বনে চলে গেলেন। রাজ্যের প্রজারা সকলেই তাঁদের শোকে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌লো।

বিজয়ী হৈ-হয়-রাজ বীতহব্য মহানন্দে কাশীর সিংহাসন অধিকার ক'রে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব কর্‌তে সুরু কর্‌লেন। রাজা দিবোদাসকে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে বনবাসী ক'রে তাঁর সুখের ও গর্ব্বের যেন আর সীমা থাক্‌লো না।......

এদিকে রাজা দিবোদাস বনে এসে লতাপাতা দিয়ে একটি পাতার কুঁড়ে ঘর তৈরী ক'রে ফেললেন। হায়, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর

পরিহাস! যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন ও আশ্রয়দাতা—রত্ন-খচিত প্রাসাদে শত শত দাসদাসী পরিবেষ্টিত হ'য়ে যিনি বাস কর্‌তেন; দেবতাদেরও যিনি শ্রদ্ধেয় অজস্র অর্থব্যয়ে যিনি বারাণসী নগরী প্রতিষ্ঠা ক'রে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন—আজ সস্ত্রীক বাস কর্‌বার জন্য তাঁকে স্বহস্তে পর্ণকুটীর তৈরী কর্‌তে হ'লো। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া একে আর কি বলা যায়!

কিন্তু রাজা দিবোদাসের মনে সেজন্য কোনরূপ বিকার ছিলোনা। অতবড় রাজ্য হারিয়ে বনে এসেও তিনি বেশ শান্তিতেই দিন যাপন কর্‌তে লাগ্‌লেন।

মানুষের জীবন উত্থান এবং পতনেরই সমষ্টি। রাজাও ভিখারী হয় আবার ভিখারীও রাজ্য লাভ করে। বিশ্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছায় মানুষ ওঠে, আবার পড়ে; পড়ে আবার ওঠে।...মহাজ্ঞানী রাজা দিবোদাস সমস্তই বুঝ্‌তেন তাই তাঁর ভাগ্য বিপর্য্যয়ের জন্য কোনদিনই দুঃখ প্রকাশ কর্‌তেন না।

বনে বহু মুনি-ঋষির আশ্রম ছিলো। তাদের মধ্যে মহামুনি ভরদ্বাজও ছিলেন। অন্যান্য মুনি-ঋষিদের ত কথাই নাই, স্বয়ং মহর্ষি ভরদ্বাজও রাজাকে যথেষ্ট স্নেহ এবং শ্রদ্ধা কর্‌তেন। রাজা দিবোদাসও মুনিঋষিদের পরম ভক্তির চক্ষে দেখ্‌তেন; এবং তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি যে বিমল আনন্দ লাভ কর্‌তেন—রাজার জীবনে তা' বোধহয় কোনদিনই পাননি।

বলা বাহুল্য—রাজা দিবোদাসের কোন সন্তানসন্ততি ছিলো না।

মহর্ষি ভরদ্বাজের বরে এবং আশীর্ব্বাদে একবৎসর পরে রাণী এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করলেন। ঋষিরা সকলে দিবোদাসের কুটীরে সমাগত হ'য়ে নবজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তার নাম রাখলেন—"প্রতর্দ্দন"।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে।

কুমার প্রতর্দ্দন এখন কিশোর। রাজসিক যাবতীয় গুণ তার মধ্যে ফু'টে উঠেছে।...রাজা দিবোদাস নিজে তাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন; মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে সে শাস্ত্র পাঠ করে। সুতরাং একই সঙ্গে সে শস্ত্রে এবং শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জ্জন করতে থাকে।

মুনি-কুমারগণ সকলেই প্রতর্দ্দনকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে তাদের সঙ্গে প্রতর্দ্দনের ভাবও খুব! কিন্তু তাহ'লেও মুনি-কুমারদের প্রকৃতির সঙ্গে তার ঠিক্ মিস খায়না।

কেনই বা খাবে? হোক তার পিতা রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী; তবুও সে তো রাজার ছেলে; ক্ষত্রিয়ের সন্তান! তার প্রতি ধমনীতে ক্ষত্রিয়-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। বুকে তার ক্ষত্রিয়ের সাহস, ক্ষত্রিয়ের উদ্যম। বাহুতে তার ক্ষত্রিয়ের বল—প্রাণে

তার ক্ষত্রিয়ের লিপ্সা। সিংহ-শাবকের মতই সে চঞ্চল, দুঃসাহসী ও বলবান্।...নিরীহ, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ঋষি কুমারদের প্রকৃতির সঙ্গে মিল হওয়াই ত বিচিত্র।...কিন্তু ঠিক মিল না হ'লেও, যেটুকু গর্মিল্ ছিলো—সে জন্য মুনি-কুমারদের সঙ্গে তার কোন দিনই কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ হ'তো না।...তাদের পরস্পরের প্রাণের পরিপূর্ণ প্রীতি মিল্-গরমিল্ সকল কিছুর উপরে উঠে—তাদের যেন একপ্রাণ ক'রে রাখ্‌তো।

পুত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে রাজারাণীর আনন্দের যেন সীমা থাক্‌তো না। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাসও তাঁদের অজ্ঞাতে বেরিয়ে আস্‌তো। মনে মনে হয়ত ভাব্‌তেন—"হায়, আজ যদি রাজ্য থাক্‌তো, তবে এই ছেলে যুবরাজ হ'য়ে কত সুখ, কত আনন্দই না উপভোগ কর্‌তো।... কিন্তু অদৃষ্ট!"

হঠাৎ একদিন প্রতর্দ্দন তার মায়ের মুখে তার পিতার কীর্ত্তির কথা বারাণসী নগর প্রতিষ্ঠার কথা—হৈ-হয়দের আক্রমণে —তাঁর রাজ্যচ্যুত হওয়ার কথা ইত্যাদি সমস্তই শুন্‌লে। এতদিনের মধ্যে রাজা কিম্বা রাণী কেউ তাকে কোনকথা বলেন নি। তাছাড়া ওসব বিষয় বোঝ্‌বার মত বয়সও তার এতদিন হয়নি।

আজ মায়ের মুখে সমস্ত শুনে প্রতর্দ্দনের কিশোর প্রাণ

উত্তেজনায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। উঃ, এতদূর! হৈ-হয়দের অত্যাচারে আমার পিতা মহারাজ হ'য়েও আজ বনবাসী!... মহারাণী মা আমার বনবাসিনী।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার অন্তর প্রচণ্ড ক্ষোভে এবং দারুণ ক্রোধে যেন গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার চোখমুখ

লাল হ'য়ে গেলো। রাণী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সমস্তই বুঝ্‌তে পার্‌লেন—এবং তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ব'ল্‌লেন—"আর মন খারাপ ক'রে কি কর্‌বি বাবা? সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য নিয়েই মানুষের জীবন! রাজ্য হারিয়ে বনে এসেছি, কিন্তু বনে এসে তোকে পেয়েছি। তুই আমাদের সাত রাজার

ধন!···তোর বাবা বীর শক্তিমান্! তিনি নিজের হাতে 'বারাণসী রাজ্য' গড়ে তুলেছিলেন। ইচ্ছা কর্‌লে আবারও একটা রাজ্য গড়ে তুল্‌তে পার্‌তেন তিনি। কিন্তু সংসারের রীতি-নীতি দেখে দেখে ওঁর মন এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছে যে আর ও-সবের মধ্যে উনি যেতেই চান্‌না।···সে যা হোক, তোকে পেয়ে আমরা সব দুঃখ ভুলেছি। ভগবানের অনুগ্রহে তুই বেঁচে থাক—আবার আমাদের সুদিন আস্‌বে।"

মায়ের কথার উত্তরে প্রতর্দ্দন কিছু বল্‌লোনা বটে, কিন্তু মনে-মনে সে যেন গুরুতর রকমেরই কিছু একটা চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লো। ···রাজা দিবোদাসের না হয় অনেক দেখে, অনেক শুনে, অনেক আঘাত পেয়ে রাজ্য প্রভুত্ব প্রভৃতির উপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে—কিন্তু প্রতর্দ্দনের ত আর তা নয়। সে কিশোর—নূতন তার জীবন, রঙীন তার আশা, প্রবল তার বড় হবার আকাঙ্ক্ষা—অদম্য তার কৌতূহল—দুর্নিবার তার মনের গতি!···তার মনে কি আর পিতার মত বিতৃষ্ণা আস্‌তে পারে?

সুতরাং সেই দিন থেকে প্রতর্দ্দনের একমাত্র চেষ্টা হ'লো—কি ক'রে সে পিতৃরাজ্য উদ্ধার ক'র্‌বে। কেমন ক'রে সে হৈ-হয়দের দমন ক'রে তার পিতার নষ্ট-গৌরব ফিরিয়ে আন্‌বে?··· কোন্ উপায়ে সে আবার বারাণসীর সিংহাসনে তার পিতা-মাতাকে

প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজের জীবন ধন্য কর্‌বে?...মাতা পিতার দুঃখ যদি সে দূর কর্‌তে না পারে—তবে তার জীবনের সার্থকতা কি? তারা যে তার কাছে দেবতার চেয়েও পূজনীয়। তাঁদের আনন্দ দিতে না পার্‌লে, তার সুখশান্তিই বা কোথায়? না, না, যেমন ক'রেই হোক, এই দুর্দ্দিনের অবসান কর্‌তেই হ'বে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রতর্দ্দনের সঙ্কল্প দিনের পর দিন দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তা ছাড়া, যাতে সে অসাধারণ শক্তিমান্ ও দুর্জ্জয় হ'তে পারে এবং অস্ত্রবিদ্যাও খুব ভাল ক'রে শিখে ফেল্‌তে পারে—এখন থেকে তার সেই চেষ্টাই হ'লো সবচেয়ে বেশি।

বলা বাহুল্য—রণ-শাস্ত্রে রাজা দিবোদাসের প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিলো। কুমার প্রতর্দ্দন পিতার কাছ থেকে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশল একে একে শিখে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। মহর্ষি ভরদ্বাজ ধনুর্ব্বেদে পরম পণ্ডিত ছিলেন। প্রতর্দ্দন মহর্ষির কাছে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ক'রে ক্রমশঃই সুদক্ষ হ'তে লাগ্‌লো।

ফলে দু'তিন বছরের মধ্যে সে সত্যসত্যই একজন অসাধারণ অস্ত্রবিদ্যাকুশল ও শক্তিশালী বীর হ'য়ে উঠ্‌লো।

কিন্তু সে যতই শক্তিমান্ হ'য়ে উঠুক—একা কখনোই হৈ-হয়দের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে পারে না। সৈন্যের প্রয়োজন।

আর যেমন তেমন সৈন্য দিয়ে তার কাজও চল্‌বেনা। তার সৈন্যদের হ'তে হ'বে রীতিমত দুর্দ্ধর্ষ, দুঃসাহসী ও নির্ভীক্ !

কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব হয় ? প্রতর্দ্দন আবার ভাব্‌তে লাগ্‌লো। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মাথায় চমৎকার একটা ফন্দী এলো।

বনের মধ্যে বাস কর্‌তো এক অসভ্যজাতি। অসভ্য হ'লেও তারা ছিলো—যেমন সরল—তেমনি শক্তিমান্ এবং মুনি-ঋষিদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিসম্পন্ন। বিশেষ প্রতর্দ্দনকে তারা সকলেই খুব ভালবাস্‌তো।

প্রতর্দ্দন তাদের ভিতর থেকে বেশ যোয়ান এবং সাহসী দেখে দেখে অনেককে বেছে নিয়ে একটি সেনাদল গঠন ক'রে ফেল্‌লে; তারপর বিশেষ একাগ্রতার সঙ্গে তাদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ভ কর্‌লো।

তার কাণ্ডকারখানা দেখে রাজারাণী ত অবাক্ ! মুনি-ঋষিরা মৃদুস্বরে ব'ল্লেন—"সিংহের শাবক সিংহই হয় ?"—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণীও ক'রলেন—"প্রতর্দ্দন রাজা দিবোদাসের মুখ গৌরবে উজ্জ্বল কর্‌বেই।

এরপর হঠাৎ একদিন প্রতর্দ্দন বারাণসীর নিকট সসৈন্যে ছাউনী ক'রে হৈ-হয়রাজ বীতহব্যকে ব'লে পাঠালে—"হয় তার পিতৃরাজ্য ছেড়ে দেওয়া হোক্—নয় তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন্।"

হৈ-হয়রা তার কথায় কানই দিলো না। ফলে যুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো অনিবার্য্য।

একদিকে বিরাট হৈ-হয়-বাহিনী এবং বীতহব্যের শতপুত্র—অন্যদিকে তরুণ বীর কুমার প্রতর্দ্দন আর তার সংখ্যাল্প বন্য সৈন্য।

কিন্তু হ'লে কি হ'বে? প্রতর্দ্দন যেমন একাই একশ'—তার এক একটি সৈন্যকেও তৈরী ক'রেছে ঠিক তেমনি ক'রেই।

প্রতর্দ্দনের অধিনায়কত্বে তার সৈন্যগণ প্রমত্ত সিংহের মতই যুদ্ধ ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

দুই পক্ষের সৈন্যদের আস্ফালনে—আর অস্ত্রশস্ত্রের প্রচণ্ড নির্ঘোষে আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌লো।

যুদ্ধ চল্‌লো ক্রমাগত দশদিন ধরে।

প্রতর্দ্দন আর তার সৈন্যগণ যেন বীরমদে মেতে উঠেছে—হৈ-হয় পক্ষ ক্রমশঃই হ'য়ে পড়ছে নিস্তেজ!

তারপর হঠাৎ একদিন—"জয় কুমার প্রতর্দ্দনের জয়"—রবে রণস্থল মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। হৈ-হয় সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে যে যেদিকে পার্‌লো—পালিয়ে গেলো।

যুদ্ধে রাজা বীতহব্যের শত পুত্র বিনষ্ট হ'লো। রাজা বীতহব্যও প্রাণভয়ে রণস্থল ছেড়ে পালালেন।

কিন্তু প্রতর্দ্দন তাঁকে ছাড়্‌লো না। সেও ছুট্‌লো রাজার পেছনে পেছনে।

বীতহব্য প্রাণভয়ে ছুট্তে ছুট্তে একেবারে—ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রাণ-রক্ষার জন্য মুনিবরের শরণ নিলেন।

একটু পরেই প্রতর্দ্দনও সেখানে গিয়ে উপস্থিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ অনেক ক'রে বুঝিয়ে প্রতর্দ্দনকে ক্ষান্ত কর্লেন।

মহর্ষির কথা প্রতর্দ্দন ঠেল্তে পার্লো না।...রাজা বীতহব্যকে ক্ষমা ক'রে সে তার পিতামাতাকে বন থেকে নিয়ে এসে পুনরায় বারাণসীর সিংহাসনে বসালো।

ওঃ রাজা-রাণীর তখন কি অপার আনন্দ!

পুত্র-গৌরবে তাঁদের বুক যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। রাজ্যের প্রজারাও বহুদিন পরে তাদের পিতৃসম পুরাতন রাজাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে তাঁর জয়গান করতে লাগ্‌লো।…

এরপর একদিন দেবাদিদেব মহাদেব রাজা দিবোদাসের কাছে এসে বল্‌লেন—"মহারাজ তোমার রাজধানী পরম পবিত্রস্থান। আমার ইচ্ছা তোমার এখানে বাস করি। তুমি তোমার সাধের বারাণসী আমাকে দান কর এবং আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এই রাজ্য শাসন কর।"

রাজা দিবোদাস পরম কৃতার্থ হ'য়েই মহাদেবের প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন।

সেই থেকেই বারাণসী বা কাশী শিবের বাসস্থান ব'লে কীর্ত্তিত হ'য়ে আস্‌ছে; এবং দেবাদিদেবের অনুগ্রহে তার মাহাত্ম্যও দিনের পর দিন বেড়ে উঠেছে!

বলা বাহুল্য যতদিন বারাণসী বর্ত্তমান থাক্‌বে—"ততদিন রাজা দিবোদাস এবং কুমার প্রতর্দ্দনের নামও জগত থেকে বিলুপ্ত হ'বে না!

—শেষ—